।। মুভি এক্সপোজার ।।

আলোকচিত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে সিনেমাটোগ্রাফি । আলোকচিত্র শব্দটা আমাদের বলে দেয়—আলো দিয়ে যে-ছবি আঁকা হয় ।—আলো দিয়ে আঁকা ছবি ।

আলোকচিত্র শব্দটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্যামেরা নামক একটা যন্ত্র আমাদের সামনে হাজির হয় । আলো দিয়ে ছবি আঁকতে হলে ক্যামেরা ছাড়া আর একটা অপরিহার্য জিনিস—ফিল্ম । ক্যামেরা এবং ফিল্ম ছাড়া সিনেমাটোগ্রাফি কখনই সম্ভব নয় । সিনেমাটোগ্রাফি করার জন্য প্রথমে মুভি ক্যামেরার মধ্যে যথাস্থানে, 'ফিল্ম ম্যাগাজিনে' ফিল্ম নামক একটা আলোকস্পর্শকাতর রাসায়নিক সেলুলয়েডের ফিতে ভরে নিতে হবে । যেহেতু প্রকৃতিতে সব সময়, সর্বত্র আলোর উজ্জ্বলতা সমান থাকে না, তাই সঠিক আলোকচিত্রের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো । অর্থাৎ আলো নিয়ন্ত্রণ । আলোকে মুভি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত অ্যাপারচার নামক একটা যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ।

আলোকচিত্রের ধর্ম অনুযায়ী বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে ফিল্মের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিল্মের মধ্যে বস্তুর একটা সুপ্ত বিম্ব, লেটেন্ট ইমেজ সৃষ্টি হয় । ফিল্মের মধ্যে বস্তুর প্রাথমিক সুপ্তবিম্ব সৃষ্টি করার জন্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে এই যে ফিল্মের উপর ফেলা হচ্ছে, একে বলে এক্সপোজার। এক্সপোজারের বৈজ্ঞানিক প্রকাশ, সংজ্ঞা—আলোর দ্বারা সংঘটিত কোন কাজে আলোর উজ্জ্বলতার এবং সময়ের স্থিতিকালের গুণফল ।

$$E = I \times T$$

ছবি তোলার সময় কীভাবে এক্সপোজার ঠিক করা হবে, অর্থাৎ সঠিক এক্সপোজার কী হবে, এটা বোঝার জন্য সিনেমাটোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতে হবে । কেননা, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে এক্সপোজারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—

১ । অ্যাপারচার, ২। শাটার স্পিড, ৩। ফ্রেম স্পিড, ৪। ফিল্ম স্পিড, ৫। আলোর উৎস এবং উজ্জ্বলতা, ৬। ফিল্টার, ৭। বস্তুর আলো প্রতিফলন ক্ষমতা, ৮। ডেভেলপার ।

১। **অ্যাপারচার ঃ** আলোকচিত্রের পরিভাষা অনুযায়ী অ্যাপারচারকে 'f/No' চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় । অ্যাপারচার হলো ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলোর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র । আক্ষরিক অর্থে অ্যাপারচার 'f/No' (Relative aperture) লেন্সের ফোকাল লেন্থ এবং লেন্সের ব্যাসের অনুপাতের পরিমাপ । যদি আমরা লেন্সের ছিদ্র, অ্যাপারচার বড় করি, তবে বেশি পরিমাণ আলো এবং অ্যাপারচার ছোট করলে কম আলো লেন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফিল্মের উপর পড়বে। লেন্সের অ্যাপারচার প্রকাশ করা হয় একটা আন্তর্জাতিক মান, বিশেষ সংখ্যা দিয়ে—f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 ইত্যাদি ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেকটা সংখ্যা 'f/No' পূর্ববর্তী 'f/No'-এর অর্ধেক এবং পরবর্তী 'f/No'-এর দু'গুণ আলো লেন্সের মধ্যে দিয়ে ঢোকায় । এখানে আরও যা উল্লেখযোগ্য 'f/No'-এর সংখ্যা যত বাড়বে, লেন্সের ছিদ্র তত ছোট হবে এবং 'f/No' -এর সংখ্যা যত ছোট হবে লেন্সের ছিদ্র তত বড় হবে । অর্থাৎ লেন্সের অ্যাপারচার এবং লেন্সের

ছিদ্রের সম্পর্কটা বিপরীত । উপরে উল্লিখিত সিরিজে ক্রমানুসারে f/1.4, ‘f/No’ হলো সবচেয়ে বড় এবং f/22, ‘f/No’ হলো সবচেয়ে ছোট অ্যাপারচার ।

আধুনিক লেন্সে ‘f/No’ -এর সঙ্গে ‘T/No’ দিয়েও লেন্সের আলো নিয়ন্ত্রণের মান প্রকাশ করা হয় । লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো যাতায়াত করার সময় লেন্সের কিছুটা আলো শোষণ করে নেয় । একে বলে লেন্সের ট্রান্সমিশন । লেন্সের ট্রান্সমিশনের ফলে বস্তু থেকে যে পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয়ে লেন্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেই পরিমাণ আলো কিন্তু লেন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফিল্মের উপর পড়ে না । লেন্সের ট্রান্সমিশনের ফলে আলোর পরিমাণ কিছুটা কমে যায় । আবার বিভিন্ন লেন্সের ট্রান্সমিশনের পরিমাণও ভিন্ন । তাই ‘T/No’ ‘f/No’ থেকে নিখুঁতভাবে আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । যেসব ফিল্মের ‘এক্সপোজার ল্যাটিচুড’ খুবই কম, সেই সব ফিল্ম দিয়ে ছবি তোলার ক্ষেত্রে ‘T/No’ -এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

সিনেমাটোগ্রাফিতে, মুভি অ্যাপারচারের ক্ষেত্রে সাধারণত ‘f/No’ বা ‘T/No’ -এর একটা নির্দিষ্ট মান, সুটিং অ্যাপারচার স্থির করে । সেই সঙ্গে এক্সপোজারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়গুলি নির্বাচন করে এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করা হয় । এই জন্য ‘f/No’ বা ‘T/No’ অনুসারে আলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় । তাই মুভি এক্সপোজারের ক্ষেত্রে অ্যাপারচারের গুরুত্ব সর্বাধিক ।

২. **শাটার ঃ** মুভি ক্যামেরার শাটার লেন্সের পিছনে অবস্থিত ঘূর্ণায়মান একটা গোলাকার (৩৬০°) চাকতি । এই চাকতির কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকে । ৩৬০° ডিগ্রি চাকতির এই ফাঁকা অংশটাকে বলে শাটার ওপনিং বা শাটার অ্যাঙ্গল, লেন্সের মধ্যে দিয়ে আসা আলো যার ভিতর দিয়ে এসে ফিল্মের উপর পড়ে । শাটার ওপনিং এবং শাটার স্পিড পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শাটারের কতটা অংশ ফাঁকা থাকবে অর্থাৎ শাটার ওপনিং কী হবে সেটা নির্ভর করে শাটারের গতি বা শাটার স্পিডের উপর । আবার শাটার স্পিড নির্ভর করে শাটার ওপনিং-এর উপর । ধরা যাক শাটার ওপনিং ১৮০°, এই ক্ষেত্রে শাটার স্পিড হবে— ১৮০°/২৪ × ৩৬০° = ১/৪৮ প্রতি সেকেণ্ড । আবার যদি শাটার স্পিড সেকেণ্ডে ১/৬০ বার হয়, তবে শাটার ওপনিং হবে ৩৬০° × ২৪/৬০ = ১৪৪° । এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, শাটার ওপনিং বাড়লে বা কমলে আলো যথাক্রমে বেশি এবং কম পরিমাণে ফিল্মের উপর পড়বে । আবার শাটার স্পিড বাড়লে বা কমলে আলো যথাক্রমে কম এবং বেশি পরিমাণে ফিল্মের উপর পড়বে ।

শাটার ওপনিং ১৮০° থাকলে যে পরিমাণ আলো ফিল্মের উপর পড়ত, শাটার ওপনিং যদি ৩৬০° করা হয় তবে দু’গুণ এবং ৯০° শাটার করা হলে অর্ধেক আলো ফিল্মের ওপর পড়বে ।

শাটার ডিগ্রি	৯০°	১৮০°	৩৬০°
অ্যাপারচার	f/৮	f/১১	f/১৬

শাটার স্পিড যদি ১/৪৮ সে. থেকে ১/২৪ সে. করা হয় তবে দু’গুণ এবং ১/৯৬ সে. করা হলে অর্ধেক আলো ফিল্মের উপর পড়বে ।

শাটার স্পিড	১/২৪ সে.	১/৪৮ সে.	১/৯৬ সে.
অ্যাপারচার	f/১৬	f/১১	f/৮

৩. **ফ্রেম ঃ** মুভি ক্যামেরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টা ফ্রেমে চলে । ফ্রেমের গতি বাড়িয়ে ছবিতে ‘স্লো-মোশান‘ এবং ফ্রেমের গতি কমিয়ে ‘ফাস্ট-মোশান’ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয় । সেকেণ্ডে ২৪টা ফ্রেমের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ আলো ফিল্মের উপর পড়ে, যদি সেকেণ্ডে ১২টা ফ্রেমে চলে তবে দু’গুণ এবং সেকেণ্ডে ৪৮টা ফ্রেমে চললে অর্ধেক আলো ফিল্মের উপর পড়বে ।

ফ্রেম প্রতি সেকেন্ডে	১২ টা	২৪ টা	৪৮ টা

অ্যাপারচার	f/১৬	f/১১	f/৮

বিভিন্ন এক্সপোজার মিটারের আবিষ্কারক ডন নরউডের মতে, একটা মুভি ক্যামেরার আদর্শ শাটার ওপনিং ১৭৫°, শাটার স্পিড ১/৫০ সে. এবং সেকেণ্ডে ২৪টা ফ্রেম হওয়া উচিত।

৪. **ফিল্ম** ঃ ফিল্ম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ফিল্ম স্পিড এবং অ্যাপারচারের সম্পর্ক— যখন সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেম, শাটার স্পিড ১/৫০ সে. এবং শাটার ওপনিং ১৭৫° এবং আলোর প্রকৃতি স্বাভাবিক।

ফিল্ম স্পিড আই. এস. ও	৫০	১০০	২০০
অ্যাপারচার	f/১১	f/১৬	f/২২

৫. **আলোর উৎস এবং উজ্জ্বলতা ঃ** সিনেমাটোগ্রাফির জন্য দু'ধরনের উৎসের আলো ব্যবহার করা হয়। সূর্যের আলো বা প্রকৃতির আলো এবং কৃত্রিম আলো। বিভিন্ন কারণে দিনের আলোর উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। সাধারণত সকালবেলার আলোর উজ্জ্বলতা থেকে দুপুরবেলার আলোর উজ্জ্বলতা চারগুণ এবং বিকেলবেলার আলোর উজ্জ্বলতা দু'গুণ বেশি। আবার গরমকালের আলোর উজ্জ্বলতা শীতকালের আলোর উজ্জ্বলতা থেকে বেশি। দিনের আলোতে ছবি তোলার জন্য মূলত আকাশে মেঘের অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ মেঘ সূর্যের আলোকে কী পরিমাণ বাধা দিচ্ছে তার মান বা আলোর উজ্জ্বলতা অনুসারে চারটে পৃথক অবস্থার কথা মনে রাখতে হবে।

১। **উজ্জ্বল সূর্যালোক/bright light ঃ—** যখন বিষয়বস্তুর গাঢ় ছায়া সৃষ্টি হয় বা দেখা যায়।

২। **মেঘলা উজ্জ্বল আলো/cloudy bright light ঃ—**যখন উজ্জ্বল সূর্যালোক মেঘের ফাঁক দিয়ে আসে এবং বিষয়বস্তুর মোটামুটি গাঢ় ছায়া সৃষ্টি করে।

৩। **মেঘলা/dull light ঃ—** সূর্য মেঘে ঢেকে গেছে কিন্তু কিছুটা আলো দেখা যাচ্ছে আকাশে এবং বিষয়বস্তুর আবছা ছায়া সৃষ্টি হচ্ছে।

৪। **খুব মেঘলা/very dull light ঃ—**সূর্য পুরো মেঘে ঢেকে গেছে এবং আকাশে কোন আলো নেই। বিষয়বস্তুর কোন ছায়া সৃষ্টি হচ্ছে না।

এক্সপোজারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়গুলো অপরিবর্তিত রেখে ১০০ আই. এস. ও ফিল্ম দিয়ে দিনের উপরিউক্ত চারটে অবস্থায় ছবি তুলতে হলে নিম্নলিখিত অ্যাপারচার ব্যবহার করতে হবে।

ফিল্ম স্পিড ১০০ আই. এস. ও শাটার স্পিড ১/৫০ সে., ১৭৫° শাটার ওপনিং এবং সেকেণ্ডে ২৪টা ফ্রেম।

উজ্জ্বল সূর্যালোক	**মেঘলা উজ্জ্বল**	**মেঘলা**	**খুব মেঘলা**
f/১৬	**f/১১**	**f/৮**	**f/৫.৬**

কৃত্রিম আলোতে ছবি তোলার জন্য 'এক্সপোজার মিটার' দিয়ে কৃত্রিম আলো পরিমাপ করে এক্সপোজার নির্ণয় করা হয়।

তবে একটা প্রচলিত পদ্ধতি এই যে—'১০,০০০' (দশ হাজার)-কে কোন নির্দিষ্ট 'ফিল্ম স্পিড' দিয়ে ভাগ করলে 'এফ/২.৮'-এর জন্য প্রয়োজনীয় 'ফুট ক্যাণ্ডল', আলোর পরিমাণ পাওয়া যায়। যেমন, যদি ফিল্ম স্পিডের মান '১০০ আই.এস.ও' হয়

তবে 'f/২.৮'-এর জন্য প্রয়োজনীয় আলোর পরিমাণ হবে ১০০০০/১০০ = ১০০ ফুট ক্যাণ্ডল । তবে, এই ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে ক্যামেরা প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ ফ্রেম × শাটার স্পিড ১/৫০ সে. × ১৭৫° শাটার ওপনিং-এ চলছে।

৬। **ফিল্টার ফ্যাক্টর ঃ** ফিল্টার অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ।

৭। **বস্তুর আলো প্রতিফলন ক্ষমতা ঃ** বস্তু থেকে আলোর প্রতিফলন তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

১। আলোর উৎসের উজ্জ্বলতা, ২। বস্তুর রঙ, ৩। বস্তুর আশপাশের পরিবেশের আলো প্রতিফলন ক্ষমতা ।

সাধারণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে এক্সপোজার ব্যবহার করা হয়, উজ্জ্বল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে (যে বিষয়বস্তুর আলোর প্রতিফলন ক্ষমতা বেশি—সাদা বা হালকা রঙের বিষয়বস্তু) এক স্টপ কম এবং যে বিষয়বস্তুর আলোর প্রতিফলন ক্ষমতা খুব কম (কালো বা গাঢ় রঙের বিষয়বস্তু) এক স্টপ বেশি এক্সপোজার ব্যবহার করতে হয় ।

বস্তুর আলো-প্রতিফলনের ক্ষমতা সিনেমাটোগ্রাফির বিশাল দিগন্ত । একই ফ্রেমের মধ্যে হয়তো এমন একাধিক বস্তু আছে, যাদের আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন । এই ক্ষেত্রে কীভাবে এক্সপোজার ঠিক করা হবে ?

আনসেল অ্যাডামের বিখ্যাত 'জোন সিস্টেম'কে 'আলোর সরগম' 'সপ্তক'-এ রূপান্তরিত করে বলা যায়—

সা—জোন এক (১) । কালো ভেলভেট, আলো প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা দুই ভাগ (২%) । ছায়া অংশের কোন বিবরণ নেই । এক্সপোজারের মান দুই (২) ।

রে— জোন দুই (২) । একটু ফ্যাকাসে কালো ভেলভেট, আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা চার ভাগ (৪%) । ছায়া অংশের কিছুটা বিবরণ পাওয়া যাবে । এক্সপোজারের মান চার (৪) ।

গা— জোন তিন (৩) । আর একটু ফ্যাকাসে কালো ভেলভেট । আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা আট ভাগ (৮%) । গড় পড়তা ছায়া অংশের বিবরণ পাওয়া যাবে । এক্সপোজারের মান আট (৮) ।

মা— জোন চার (৪) কালো-সাদার সমন্বয়ে একটা বিশেষ স্তর । আলোর প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা আঠারো ভাগ (১৮%) । যাকে আনসেল অ্যাডাম বলেছেন—'মিডল গ্রে' বা 'মিডল টোন' বা 'আঠারো ভাগ গ্রে' । যেখান থেকে পাওয়া যাবে আলো-ছায়ার পরিপূর্ণ সর্বাধিক বিবরণ । এক্সপোজারের মান ষোল (১৬) ।

পা— জোন পাঁচ (৫) । গড় পড়তা ককেশিয়ান ত্বক । আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা ছত্রিশ ভাগ (৩৬%)। আলোকিত অংশের বিবরণ পাওয়া যাবে । এক্সপোজারের মান বত্রিশ (৩২) ।

ধা— জোন ছয় (৬) একটু ঘিয়ে রঙের সাদা কাগজ । আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) । আলোকিত অংশের বিবরণ কিছুটা পাওয়া যাবে । এক্সপোজারের মান চৌষট্টি (৬৪) ।

নি— জোন সাত (৭) ম্যাগনেশিয়াম কারবোনেট । আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ (৯৬%) আলোকিত অংশের কোন বিবরণ পাওয়া যাবে না । এক্সপোজারের মান একশো আঠাশ (১২৮) ।

'১৮% গ্রে' সিনেমাটোগ্রাফির আর এক দিগন্ত । যদিও তথ্যগতভাবে একই এক্সপোজার ব্যবহার করে একই ফ্রেমের মধ্যে আমরা জোন এক এবং সাতকে প্রতিফলিত করতে পারি না, তথাপি আদর্শ আলোকচিত্রের জন্য একই ফ্রেমের মধ্যে জোন দুই এবং ছয়কে অতিক্রম করে ৮১ ভাগ পর্যন্ত আলোর প্রতিফলন বিবেচনা করা হয় । সেই সূত্রে $\sqrt{(\times((}$ = ১৮% ভাগ গ্রে । প্রমাণিত হয়েছে যে, শতকরা আঠারো (১৮%) ভাগ গ্রে, এমন বস্তুকে ভিত্তি করে যদি এক্সপোজার নির্ণয় করা যায়, তবে সাধারণ ফিল্মের কার্যকরী এক্সপোজার অঞ্চল সাদা-কালোর, আলো-ছায়ার ডিটেলসহ সর্বাধিক ব্যবহার করা যায় । অর্থাৎ আণ্ডারের দিকে তিন (৩) স্টপ এবং ওভার দিকেও তিন (৩) স্টপ এক্সপোজার অঞ্চল ব্যবহার যোগ্য থাকে । অর্থাৎ শতকরা ছিয়ানব্বই (৯৬%) ভাগ থেকে শতকরা দুই (২%) ভাগ আলো প্রতিফলিত করে এমন বস্তুও (১ : ৭ এক্সপোজার পরিসর '২ : ১২৮', ২% থেকে ৯৬% প্রতিফলিত আলো-ছায়ার তফাৎ) যদি একই ফ্রেমের মধ্যে থাকে, তবে সেগুলোও ব্যবহার যোগ্য এক্সপোজার পরিসর ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের 'টো থেকে সোল্ডার' অংশের মধ্যে থাকবে । এই সর্বাধিক এক্সপোজার পরিসর, আলো-ছায়ার নির্দিষ্ট তফাৎকে ভিত্তি করেই আধুনিক এক্সপোজার মিটারগুলো

‘আঠারো (১৮%) ভাগ গ্রে’কে মান ধরে আলোর পরিমাণ নির্ধারণ বা পরিমাপ করে ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, যদি কোন বিষয়বস্তুর রূপ এমনই হয় যে, অর্ধেকটা সাদা এবং অর্ধেকটা কালো, তবে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কথা মনে রেখে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর কোন্ অংশটা বেশি দরকার, সেটা স্থির করে তার উপর এক্সপোজার নির্ণয় করতে হবে । তবে, সাদা-কালোর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিশেষ ধরনের ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে ।

খুব সাদা বা উজ্জ্বল বিষয়বস্তু	**সাধারণ বিষয়বস্তু**	**কালো বিষয়বস্তু**
f/১৬	**f/১১**	**f/৮**

৮। **ডেভেলপার ঃ** এক্সপোজড ফিল্মের সুপ্তবিম্ব, লেটেন্ট ইমেজ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডেভেলপ করে দৃশ্যবিম্ব, নেগেটিভে রূপান্তরিত করা হয় । তাই এক্সপোজার নির্ণয়ের সময় কী ধরনের ডেভেলপারে কতক্ষণ ডেভেলপ করব, এবং ডেভেলপার ও জলের মিশ্রণের অনুপাত, কী উত্তাপে ফিল্মটা ডেভেলপ করা হবে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় । তা না হলে সঠিক এক্সপোজারে ছবি তুলেও মূলত ডেভেলপমেন্টের দোষে, হেরফেরের জন্য সঠিক নেগেটিভ পাওয়া যাবে না । উপরিউক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে এক্সপোজারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ।

ডেভেলপারের উত্তাপ বাড়ালে এবং কমালে ফিল্ম ডেভেলপিং-এর সময়ও যথাক্রমে কমবে এবং বাড়বে । আবার ডেভেলপারে জলের অনুপাত বাড়ালে এবং কমালে ফিল্ম ডেভেলপিং-এর সময়ও যথাক্রমে বাড়বে এবং কমবে । ফিল্ম ডেভেলপিং-এর সময় কমালে এবং বাড়ালে এক্সপোজারও যথাক্রমে বাড়াতে এবং কমাতে হবে ।

এক্সপোজার সম্বন্ধে সঠিক ধারণার জন্যে আরও তিনটি বিষয় ভালভাবে বুঝতে হবে ।

১। **এক্সপোজার বা ফিল্ম ল্যাটিচুড ঃ** ফিল্ম ইমালশান এমনভাবে তৈরি যে বিষয়বস্তুর আলো-ছায়ার পার্থক্য যদি খুব কম থাকে, তবে এক্সপোজার এক স্টপ বেশি-কম হলেও বিষয়বস্তুর উজ্জ্বল অংশ থেকে ছায়া অংশের বর্ণক্রম এবং ডিটেল নিখুঁত পাওয়া যায় । ফিল্ম ইমালশানের উপরেই নির্ভর করে এক্সপোজার ল্যাটিচুডের পরিমাণ । এক-একটা ফিল্মের এক্সপোজার ল্যাটিচুড এক-এক রকম এবং ফিল্ম ল্যাটিচুডের চরিত্রও বিস্ময়কর ।

২। **মিনিমাম কারেক্ট এক্সপোজার ঃ** কোন বিষয়বস্তুর ছায়া অংশের বিস্তারিত বিবরণ এবং বর্ণক্রম পাওয়ার জন্য, যে এক্সপোজার ব্যবহার করতে হয় তাকে বলে মিনিমাম কারেক্ট বা ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার । **ওভার এক্সপোজার** ছবিকে গ্রেনি করে এবং ছবির বর্ণক্রম বজায় থাকে না । আবার **আণ্ডার এক্সপোজার** ছবির ছায়া অংশের ডিটেল ধরতে পারে না । ভিন্ন দৃষ্টিতে **মিনিমাম কারেক্ট এক্সপোজার** হলো সেই এক্সপোজার, যে এক্সপোজার ব্যবহার করলে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় অংশের বা সর্বাধিক অংশের বিস্তারিত বিবরণ এবং সঠিক বর্ণক্রম পাওয়া যায় । ন্যূনতম সঠিক, মিনিমাম কারেক্ট এক্সপোজারকে ভিত্তি করেই শিল্পী ক্রিয়েটিভ এক্সপোজার ব্যবহার করেন ।

৩। **ক্রিয়েটিভ এক্সপোজার ঃ** সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে সিনেমাটোগ্রাফার, শিল্পীমনের ভাবপ্রকাশের জন্য, বিশেষ মেজাজ সৃষ্টির জন্য যে এক্সপোজার ব্যবহার করেন, তাকে বলে **‘ক্রিয়েটিভ এক্সপোজার’** । এক্সপোজারের নিয়ম কানুন না জেনে, ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন না করে কখনই ‘ক্রিয়েটিভ এক্সপোজার’ সৃষ্টি করা যায় না । শিল্পী নিজের প্রয়োজনেই ব্যাকরণ তৈরী করেন এবং সেটা আবার ভাঙেন । শিল্পীর জন্য কোন ব্যাকরণ নেই । শিল্পীর আছে সৃষ্টির কল্পনা ও বিজ্ঞানের সীমাহীন অনন্ত প্রকাশ ।

$$\text{Footcandle} = \frac{\text{Aperture}^2 \times \text{Shutter speed} \times \text{Frame per second} \times \text{Shutter degree}}{\text{Film speed} \times \text{Shutter opening} \times 2}$$

INCIDENT LIGHT TABLE IN FOOT CANDLES

24 F.P.S.—APPROXIMATELY SHUTTER SPEED 50 TIMES PER SECOND & SHUTTER OPENING $170^0/175^0/180^0$

ISO/Exp. Index	f/1.4	f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16
12	200	400	800	1600	3200	6400	13000	25000
16	160	320	640	1250	2500	5000	10000	20000
20	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
25	100	200	400	800	1600	3200	6400	13000
32	80	160	320	640	1250	2500	5000	10000
40	60	125	250	500	1000	2000	4000	8000
50	50	100	200	400	800	1600	3200	6400
64	40	80	160	320	640	1250	2500	5000
80	30	60	125	250	500	1000	2000	4000
100	25	50	100	200	400	800	1600	3200
125	20	40	80	160	320	640	1250	2500
160	15	30	60	125	250	500	1000	2000
200	12	25	50	100	200	400	800	1600
250	10	20	40	80	160	320	640	1250
320	8	15	30	60	125	250	500	1000
400	6	12	25	50	100	200	400	800
500	5	10	20	40	80	160	320	640
650	4	8	15	30	60	125	250	500
800	3	6	12	25	50	100	200	400
1000	$2^1/_2$	5	10	20	40	80	160	320
1250	2	4	8	15	30	60	125	250

পূর্ণ অ্যাপারচারের $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ অংশ বন্ধ এবং খোলা অবস্থার পরিমাপের তালিকা

	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8	11.3	16	22.6	
$\downarrow\frac{1}{4}$	1.1	1.5	2.1	3	4.2	6	8.5	12	17	24	
$\downarrow\frac{1}{2}$	1.2	1.6	2.3	3.2	4.5	6.3	9	12.7	18	25	
$\downarrow\frac{3}{4}$	1.3	1.8	2.5	3.6	5	7.1	10	14.2	20	28	

INCIDENT LIGHT TABLE IN FOOT CANDLES

24 F.P.S.—APPROXIMATELY SHUTTER SPEED 50 TIMES PER SECOND & SHUTTER OPENING $170^0/175^0/180^0$

ISO/Exp. Index	T/1.4	T/2	T/2.8	T/4	T/5.6	T/8	T/11	T/16
2000	1.25	2.5	5	10	20	40	80	160
1600	1.5	3	6	12	25	50	100	200
1250	2	4	8	16	32	64	125	250
1000	2.5	5	10	20	40	80	160	320
800	3	6	12	25	50	100	200	400
650	4	8	16	32	64	125	250	500
500	5	10	20	40	80	160	320	650
400	6	12	25	50	100	200	400	800
320	8	16	32	64	125	250	500	1000
250	10	20	40	80	160	320	650	1290
200	12	25	50	100	200	400	800	1625
160	16	32	64	125	250	500	1000	2050
125	20	40	80	160	320	650	1290	2580
100	25	50	100	200	400	800	1625	3250
80	32	64	125	250	500	1000	2050	4100
64	40	80	160	320	650	1290	2580	5160
50	50	100	200	400	800	1625	3250	6500
40	64	125	250	500	1000	2050	4100	8200
32	80	160	320	650	1290	2580	5160	
25	100	200	400	800	1625	3250	6500	

।। ডেভেলপমেন্ট ।।

'যদি ল্যাবের কাজ সঠিক হয়, তবে তুমি ছবির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারবে । এবং সেটা হবে সত্যি সত্যি ম্যাজিকের বিস্ময় ।'—স্বেন নিকভিস্ট

যত ভালোই ছবি তোলা হোক না কেন, ল্যাবের সামান্য ভুলে কিছুই পাওয়া না যেতে পারে । সব সিনেমাটোগ্রাফারই ল্যাবের সহযোগিতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল । যতদিন ল্যাবের রিপোর্ট না পাওয়া যাচ্ছে, সব সিনেমাটোগ্রাফার ল্যাবজ্বরে ভোগেন । এই যন্ত্রণার, উত্তেজনার সীমা নেই, আর এর হাত থেকে কারও মুক্তি নেই । কী হয় ?

ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল । আগেই বলা হয়েছে ভাল নেগেটিভের প্রাথমিক স্তর ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজ । এক্সপোজার নির্ণয়ের সময় বাঞ্ছিত ফলের জন্য বিবেচনা করতে হয়, কী স্পিডের ফিল্ম ? আন্ডার না ওভার এক্সপোজ করা হবে ? কী ডেভেলপারে, কত উত্তাপে, কত ভাগ জলের মিশ্রণে, কতক্ষণ ফিল্মটা ডেভেলপমেন্ট করা হবে ?

ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের সময়ের সঙ্গে ফিল্ম স্পিড, উত্তাপ, জলের মিশ্রণের অনুপাত, এই বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । চলচ্চিত্রের ফিল্ম বাড়িতে ডেভেলপ করা অসম্ভব । এটা একান্তভাবেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং চূড়ান্ত পেশাদারী দক্ষতার কাজ । অনেক সময় আউটডোরে ছবি তুলে খুব তাড়াতাড়ি তার ফলাফল জানার প্রয়োজন হয় । সেই ক্ষেত্রে পাঁচ-দশ ফুট ফিল্ম স্পটে টেস্ট করা যেতে পারে, যদি সঙ্গে ডেভেলপিং ট্যাঙ্ক এবং কেমিক্যাল নিয়ে যাওয়া হয় । স্পটে ট্যাঙ্ক ডেভেলপিং-এর ফলাফল, পেশাদারী রিপোর্ট না পাওয়া গেলেও, যে ফলাফল পাওয়া যায়—সেটাকে 'গাইড লাইন' ধরে সিনেমাটোগ্রাফার কাজ চালিয়ে যেতে, সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেন । মূলত, স্পটে ট্যাঙ্ক ডেভেলপিং-কে কেন্দ্র করে ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে । যার ফলে ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠবে এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সিনেমাটোগ্রাফারকে ঝুঁকি নিতে সাহসী করবে ।

১। ফিল্ম স্পিড ঃ— ফিল্ম স্পিড যত বাড়বে ততই ফিল্ম বেসের উপর ইমালশানের পরিমাণ বাড়বে, অর্থাৎ ফিল্মটা পুরু বা মোটা হবে । অতএব ফিল্ম স্পিড কমলে এবং বাড়লে ডেভেলপিং-এর সময়ও কমবে এবং বাড়বে । সাধারণভাবে সাদা-কালো ফিল্মের ফিল্মস্পিড যদি এক স্টপ বাড়ে, অর্থাৎ আই. এস. ও/১০০ এটাই যদি '২০০' হয়, সে ক্ষেত্রে ডেভেলপিং-এর সময় শতকরা কুড়ি (২০) ভাগ বাড়বে । অর্থাৎ ফিল্মস্পিড কমলে বা বাড়লে ডেভেলপিং এর সময়ও শতকরা কুড়ি (২০) কমবে বা বাড়বে । **এই নিয়মটা সাধারণ রঙিন ফিল্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়** ।

২। উত্তাপ ঃ— প্রতিটা রাসায়নিক দ্রব্যের মত ডেভেলপারও তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় । এই জন্য তাপমাত্রা (২০° ফারেনহাইট) বাড়লে বা কমলে ফিল্ম ডেভেলপিং-এর সময়ও শতকরা পাঁচ ভাগ (৫) কমবে এবং বাড়বে ।

৩। জল মিশ্রণের অনুপাত ঃ— ডেভেলপারের সঙ্গে যত জল মেশানো যাবে, ততই ডেভেলপার তরল হয়ে যাবে এবং কার্যক্ষমতা কমবে । তাই ডেভেলপারের সঙ্গে এক (১) ভাগ জল মেশালে ডেভেলপিং-এর সময় শতকরা কুড়ি (২০) ভাগ বাড়াতে হবে । উল্লেখযোগ্য, একই ডেভেলপারে দ্বিতীয়বার ফিল্ম ডেভেলপ করাতে হলে শতকরা পঁচিশ (২৫) ভাগ

সময় বাড়াতে হবে। কারণ, প্রথম ফিল্মটা ডেভেলপমেন্টের ফলে ডেভেলপার কার্যক্ষমতা হারিয়ে কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আরও যা উল্লেখযোগ্য, ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের সময় ট্যাঙ্কটা নাড়াচাড়া করতে হয়। না হলে ডেভেলপার ফিল্মের হাইলাইট, ওভার এক্সপোজড অংশে তাড়াতাড়ি এবং আন্ডার এক্সপোজড অংশে আস্তে আস্তে কাজ করবে। ফলে, ডেভেলপমেন্টে অসংগতি দেখা দেবে। ট্যাঙ্ক নাড়াচাড়ার উপর ডেভেলপমেন্টের সময় নির্ভরশীল। ট্যাঙ্ক বেশী নাড়াচাড়া করলে ফিল্মের উপর ডেভেলপার খুব তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া করে। ডেভেলপমেন্টের সময় ট্যাঙ্কটা কী রকম নাড়াচাড়া করতে হবে সেটা অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করতে হয়। সাধারণভাবে এক (১) মিনিটে ট্যাঙ্কটা দশ (১০) বার উপর নীচ করতে হয়। যদি উপর নীচ মিনিটে কুড়ি (২০) বার করা হয়, তবে ডেভেলপিং-এর সময় শতকরা কুড়ি (২০) ভাগ কমবে।

একটা ফিল্ম ডেভেলপ করে নেগেটিভে রূপান্তরিত করার জন্য অনেকগুলো রাসায়নিক স্তর অতিক্রম করতে হয়। এই স্তরগুলোর যে কোনও একটাতে অসংগতি হলেই, তার ফল ভোগ করতেই হবে। ভাল নেগেটিভ পাওয়া যাবে না। তাই ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের সময় খুব সতর্কতার সঙ্গে যত্নসহকারে প্রতিটা রাসায়নিক স্তর বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে গুরুত্ব দিতে হবে ডেভেলপমেন্টের সময় এবং উত্তাপের উপর। একটা ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের সময় যে বিভিন্ন রাসায়নিক স্তরগুলি ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করতে হয়—

সাদা-কালো এক্সপোজড ফিল্ম

ডেভেলপার 'কোডাক ডি-৭৬'। উত্তাপ—২০° সেঃ

১। **রিংসিং** ফিল্মটা প্রথমে দুই (২) থেকে তিন মিনিট ভালভাবে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।	১। এর ফলে ফিল্মবেসের তলার রাসায়নিক দ্রব্য ধুয়ে গিয়ে ফিল্মটা ভালভাবে ভিজে যাবার দরুণ ডেভেলপার ফিল্মের সর্বাংশে সমানভাবে ক্রিয়া করবে।
২। **ডেভেলপিং** নির্দিষ্ট সময়—নয় (৯) মিনিট পর্যন্ত ফিল্মটা ডেভেলপারের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে নাড়া-চাড়া করা বা রাখা।	২। ফিল্মের সুপ্ত প্রতিবিম্বকে দৃশ্য প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করে।
৩। **স্টপবাথ** কুড়ি (২০) থেকে তিরিশ (৩০) সেকেণ্ড ফিল্মটা স্টপবাথে রাখা।	৩। ফিল্ম স্টপবাথের মধ্যে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডেভেল-পারের প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ওভার ডেভেলপ হবার সম্ভাবনা থাকে না।
৪। **হার্ড্রেনিং** গরমকালে ফিল্ম তিন (৩) থেকে পাঁচ (৫) মিনিট হার্ডেনারের মধ্যে রাখা উচিত।	৪। হার্ডেনিং ফিল্মের ইমালশান গলা বন্ধ করে
৫। **রিংসিং** দুই (২) থেকে তিন (৩) মিনিট ফিল্মটা পরিষ্কার জলে ভাল ভাবে ধুয়ে নেওয়া।	৫। ফিল্মের গায়ে লেগে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
৬। **ফিক্সিং** তিন (৩) থেকে পাঁচ (৫) মিনিট ফিল্মটা ফিক্সারে ফিক্স করতে হবে।	৬। ফিল্ম থেকে এক্সপোজড না হওয়া অংশ ধুয়ে পরিষ্কার করে স্থায়ী নেগেটিভ তৈরী করে।
৭। **ওয়াশিং** কুড়ি (২০) থেকে তিরিশ (৩০) মিনিট ফিল্মটা পরিষ্কার চলমান জলে ভাল ভাবে ধুয়ে নিতে হবে।	৭। ইমালশান, হাইপো এবং অন্যান্য রাসায়নিক অংশ ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।
৮। **ক্লিনিং বাথ** এক (১) মিনিট গ্যালক অ্যাসিড সলিউশনে ফিল্মটা ধুয়ে নিতে হবে।	৮। ফিল্মের উপর সাদা চক্রাকার জলের দাগ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
৯। **শটওয়াশ** তিন (৩) থেকে চার (৪) মিনিট পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া।	৯। ক্লিনিংবাথের বা অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য ফিল্মের গায়ে লেগে থাকলে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
১০। **ওয়েটিং এজেন্ট** পরিষ্কার জলে কয়েক ফোঁটা ওয়েটিং এজেন্ট মিশিয়ে ফিল্মটা ধুয়ে নিতে হবে।	১০। ফিল্মের গায়ে লেগে থাকা জল সহজে গড়িয়ে পড়বে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
১১। **ড্রায়িং** ছায়াচ্ছন্ন, ধুলোহীন পরিষ্কার জায়গায় ফিল্মটা ঝুলিয়ে দিতে হবে।	১১। ফিল্মটা সহজে শুকিয়ে গিয়ে টান টান থাকবে।
১২। **স্থায়ী নেগেটিভ।**	১২। যেটা থেকে পজিটিভ প্রিন্ট করা যাবে।

রঙিন এক্সপোজড ফিল্মকে ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন স্তর
ডেভেলপার 'কোডাক ই. সি. এন-২'

১। **প্রিবাথ** ফিল্মটা দশ (১০) সেকেণ্ড ভাল ভাবে প্রিবাথে ধুতে হবে ।	১। ফিল্মটা সম্পূর্ণ জলে ভিজে নরম হবে
২। **রিনসিং** পাঁচ (৫) সেকেণ্ড পরিষ্কার জলে রিনসিং করতে হবে ।	২। ফলে, ফিল্মের 'রিম-জেট' ধুয়ে গিয়ে ডেভেলপমেন্টের উপযুক্ত হবে ।
৩। **ডেভেলপমেন্ট** একশো আশি (১৮০) সেকেণ্ড ডেভেলপারের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে নাড়াচাড়া করতে হবে ।	৩। ফিল্মের সুপ্তি প্রতিবিম্ব দৃশ্য প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত হবে।
৪। **স্টপবাথ** তিরিশ (৩০) সেকেণ্ড স্টপবাথে রাখতে হবে ।	৪। ডেভেলপারের প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে । ওভার ডেভেলপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না ।
৫। **ওয়াশ** তিরিশ (৩০) সেকেণ্ড পরিষ্কার জলে ধুতে হবে।	৫। ফিল্মটার গায়ে লেগে থাকা রাসায়নিক দ্রব্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে ।
৬। **ব্লিচিং** একশো আশি (১৮০) সেকেণ্ড ব্লিচারে ব্লিচ করতে হবে ।	৬। মেটালিক সিলভারকে সিলভার সল্টে রূপান্তরিত করে ।
৭। **ওয়াশ** ষাট (৬০) সেকেণ্ড পরিষ্কার জলে ধুতে হবে ।	৭। ফিল্মর গায়ে লেগে থাকা রাসায়নিক দ্রব্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে ।
৮। **ফিক্সিং** একশো কুড়ি (১২০) সেকেণ্ড ফিক্সারে ফিক্স করতে হবে ।	৮। ফিল্মের এক্সপোজড অংশকে স্থায়ী করে বাকি ইমাল-শান ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় ।
৯। **ওয়াশ** একশো কুড়ি (১২০) সেকেণ্ড পরিষ্কার চলমান জলে ধুতে হবে ।	৯। ফিল্মের গায়ে লেগে থাকা রাসায়নিক দ্রব্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে ।
১০। **স্টাব্লিসিং** দশ (১০) সেকেণ্ড স্টেবিলাইজারে রাখতে হবে ।	১০। রঙিন ইমেজকে উন্নত করে এবং ফাংগাস সৃষ্টি বন্ধ করে ।
১১। **ড্রায়িং** ফিল্মটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুকিয়ে নিতে হবে।	১১। ফিল্মটা শুকিয়ে স্থায়ী নেগেটিভে রূপান্তরিত হবে ।
১২। **স্থায়ী নেগেটিভ** ।	১২। যেটা থেকে পজিটিভ প্রিন্ট করা যাবে ।

MECHANICAL SPECIFICATIONS FOR PROCESS ECN-2

Process steps	Kodak Formula		Temperature		Time	Replenishment (wash) Rate per 30.5m (100ft) of 35mm film[a]	Recirculation(R) Filtration(F); Turbulation(T)
	Tank	Replen.	°C	°F			
Prebath	PB-2	PB-2R	27 ± 1	80 ± 2	10"	400 ml	R & F
Rem-Jet Removal and Rinse	—	—	27—38	80—100	5"	2.7 ml[b]	@20—40 l/min None
Developer	SD-49	SD-49R	41.1 ± 0.1[c]	106 ± 0.2[c]	3'00"[c]	900 ml	R, F, [d] & T [e]
Stop	SB-14	SB-14	27—38	80—100	30"	600 ml	R & F @20—40 l/min
Wash	—	—	27—38	80—100	30"	1.3 l[f]	None
Bleach[g]	SR-29	SR-29R	38 ± 1	100 ± 2	3'00"	200 ml	R & F @20—40 l/min
Wash	—	—	27—38	80—100	1'00"	1.3 l[f]	None
Fixer	F-34a	F-34Ra	38 ± 1	100 ± 2	2'00"	600 ml[h]	R & F @20—40 l/min
Wash	—	—	27—38	80—100	2'00"	270 ml[i]	None
Stabilizer	S-15	S-15R	27—38	80—100	10"	400 ml	R & F @20—40 l/min

	Type of Dryer	Temperature	RH	Air Flow	Time
Dryer[j]	impingement	32°—47° C (90°—117° F)	30%—50%	28m³/min (1000 ft³/min)	5—7 min
	nonimpingement	30°—38° C (80°—100° F)	30%—50%	28m³/min (1000 ft³/min)	6—8 min

MECHANICAL SPECIFICATIONS FOR PROCESS ECP-2

Process steps	Kodak Formula		Temperature		Time	Replenishment (wash) Rate per 30.5m (100ft) of 35 mm film[a]	Recirculation(R) Filtration(F); Turbulation(T)
	Tank	Replen.	°C	°F			
Prebath	PB-2	PB-2R	27 ± 1	80 ± 2	10—20'	400 ml	R & F
Rem-Jet Removal and Spray Rinse	—	—	27 ± 3	80 ± 5	1—2"	2.7 l[b]	@40—60 l/min None
Developer	SD-50	SD-50R	36.7 ± 0.1[c]	98.0 ± 0.2[c]	3'00"[c]	690 ml	R, F, & T
Stop	SB-14	SB-14	27 ± 1	80 ± 2	40"	770 ml	R & F @40—60 l/min
Wash	—	—	27 ± 3	80 ± 5	40"	1.2 l[f]	None
First Fixer	F-35	F-35R	27 + 1	80 + 2	40"	200 ml[g]	R & F
Wash	—	—	27 ± 3	80 ± 5	40"	1.2 l[f]	None

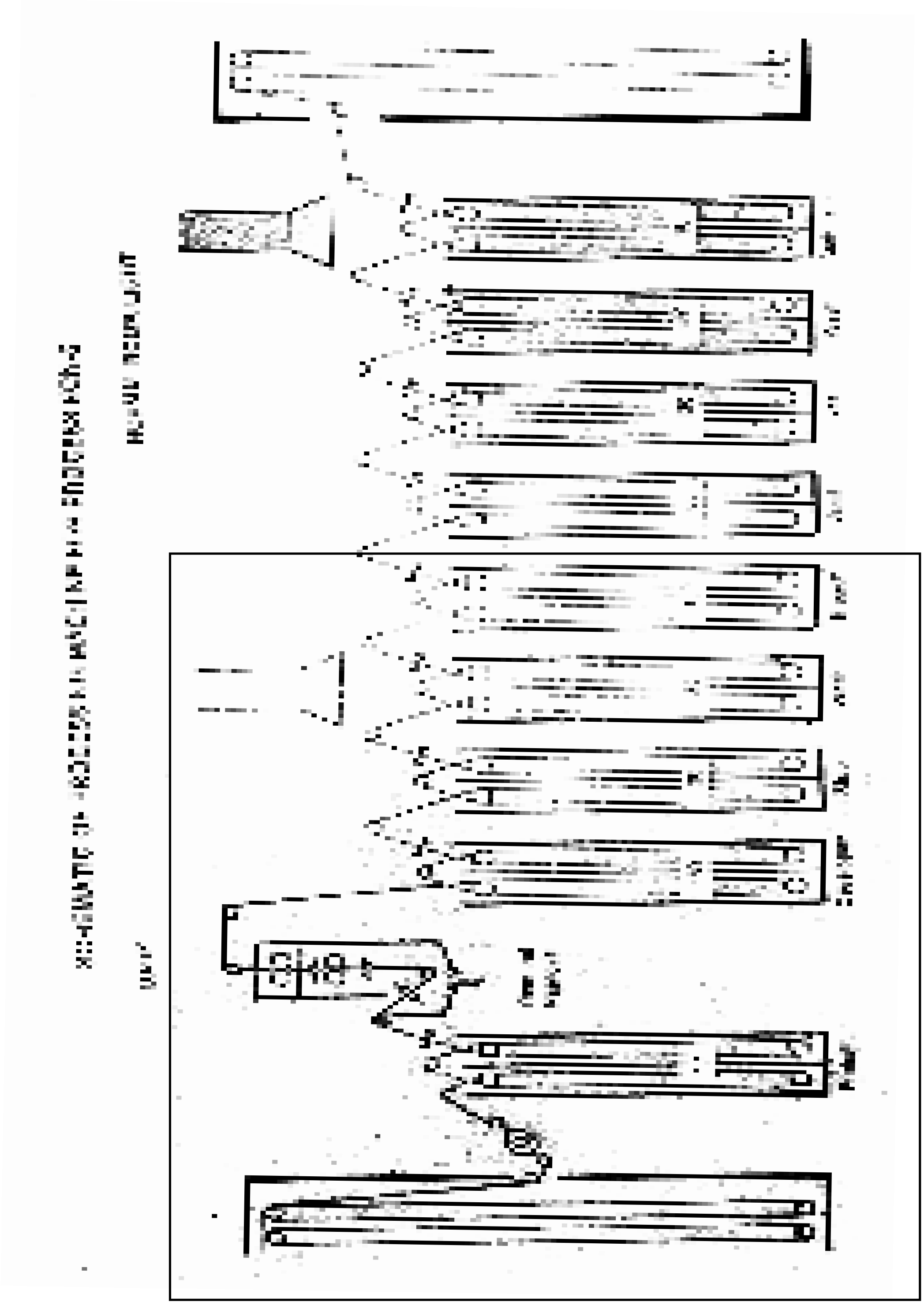

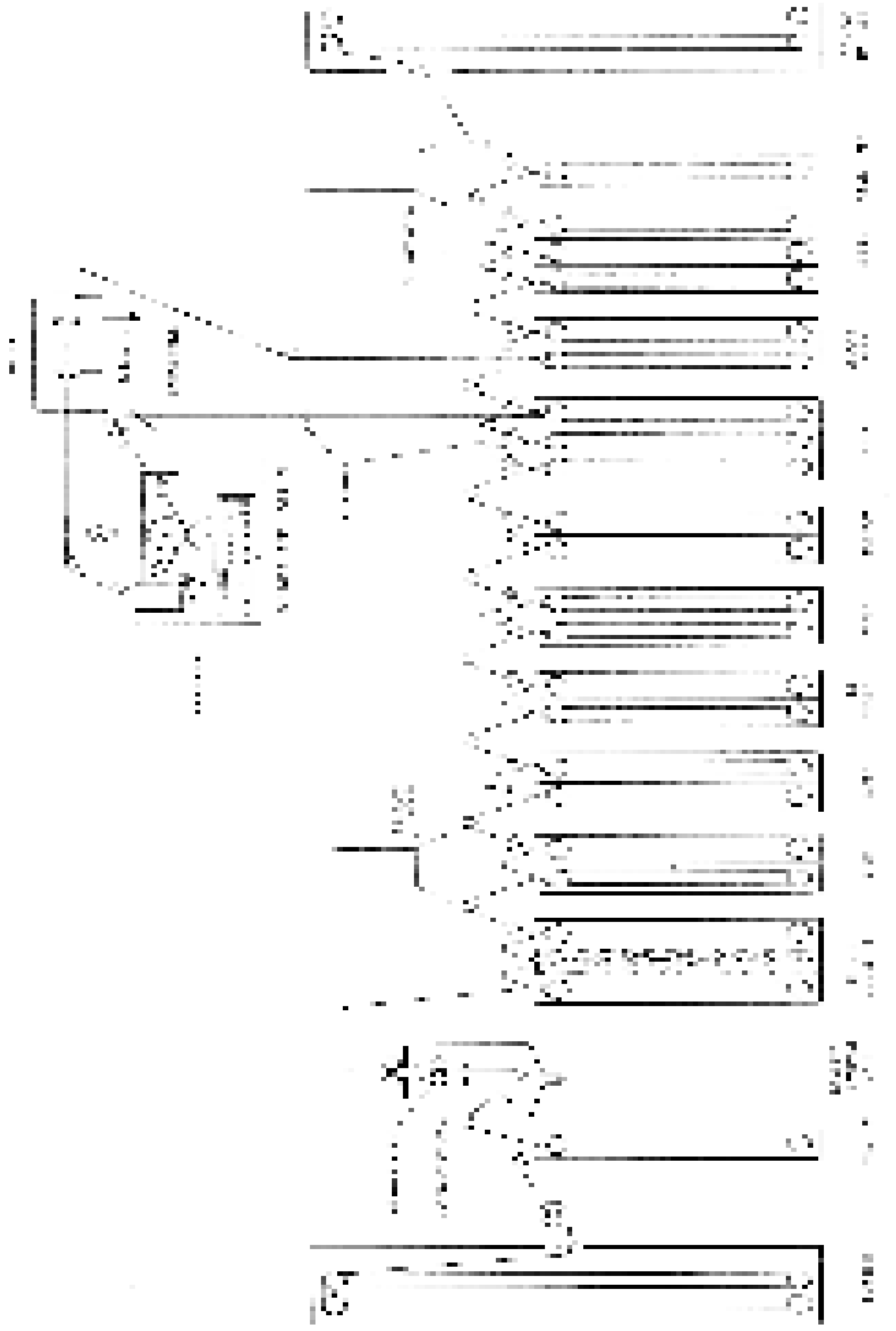

।। নেগেটিভ ।।

‘ভাল ছবির করণ কৌশলের রহস্য লুকিয়ে আছে নেগেটিভের মধ্যে । ভাল নেগেটিভ হলে সব কিছুই সম্ভব, ভাল নেগেটিভ না হলে সব কিছুই অসম্ভব ।’

নেগেটিভ থেকে একটা সঠিক পজিটিভ প্রিন্ট সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে অনুধাবন করতে হবে নেগেটিভের চরিত্র । নেগেটিভের চরিত্র বুঝতে না পারলে কখনোই ভাল নেগেটিভ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না । সেই সঙ্গে নেগেটিভ থেকে সঠিক পজিটিভ প্রিন্টও করা যাবে না ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভাল নেগেটিভের প্রাথমিক স্তর কিন্তু ‘ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার’ । যদিও ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজারের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা সুবিধা পেয়ে থাকি ফিল্ম ইমালশানের ‘এক্সপোজার ল্যাটিচুড’-এর জন্য । কিন্তু ফিল্ম ডেভেলপিং-এর সময় সামান্য এদিক ওদিক হলে তার ফলাফল আমাদের ভোগ করতেই হয় । ফলে, খুব ভালভাবে এক্সপোজড করেও ডেভেলপিং-এর দোষ-ত্রুটির জন্য আমরা ভাল নেগেটিভ নাও পেতে পারি ।

নেগেটিভের চরিত্র বলতে বোঝায়—নেগেটিভের মধ্যে সাদা-কালো অংশের, বিভিন্ন রঙের পার্থক্য—নেগেটিভ পাতলা না ঘন ইত্যাদি । অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে বলা যায়, ফিল্মের উপর আলোক সম্পাত—এক্সপোজার এবং ডেভেলপিং-এর ফলে ফিল্মের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে তারই স্বরূপ । নেগেটিভের সাদা-কালো অংশের, বিভিন্ন রঙের পার্থক্যকে বলে ‘কনট্রাস্ট’ এবং সাদা থেকে কালো অংশের ঘনত্ব পর্যন্ত বা যে কোন রঙের যে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস (হাল্কা থেকে গাঢ় পর্যন্ত) বা পর্যায় থাকে তাকে বলে টোনাল গ্রেড বা বর্ণক্রম ।

এক্সপোজার এবং ডেভেলপমেন্টের তারতম্যের ফলে নেগেটিভের চারিত্রিক পরিবর্তনের যে বিভিন্ন রূপ দেখা দেয়, তারই ফলাফল আমরা জানতে পারবো নিম্নলিখিত তালিকা থেকে ।

<u>নেগেটিভের চরিত্র</u>

ডেভেলপমেন্ট

এক্সপোজার	**কম**	**সঠিক**	**বেশী**
কম	ডিটেলসহীন এবং খুব পাতলা	ছায়া অংশের ডিটেলস নেই এবং পাতলা	খুব কনট্রাস্ট
সঠিক	পাতলা কিন্তু ডিটেলস আছে	পরিপূর্ণ ডিটেলস এবং কনট্রাস্টসহ সম্পূর্ণ টোনালরেঞ্জ আছে	কিছু ডিটেলসসহ কনট্রাস্ট
বেশী	খুব ফ্ল্যাট	ঘন কিন্তু ফ্ল্যাট	কনট্রাস্টসহ ঘন

।। গ্রেডিং / প্রিন্টিং ।।

গ্রেডিং, নেগেটিভ-এর ঘনত্ব, ডেনসিটি অনুযায়ী সঠিক পজিটিভ সৃষ্টি করার জন্য ‘প্রিন্টিং লাইট’ নির্বাচন করার পদ্ধতি ।

ছবির প্রকৃতি অনুযায়ী সিনেমাটোগ্রাফার আলো দিয়ে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে । এই ভাব প্রকাশের জন্য ছবি তোলার সময় সিনেমাটোগ্রাফারকে বিভিন্ন রকম, বিভিন্ন পরিমাণ আলো এবং সেই আলো অনুযায়ী বিভিন্ন রকম এক্সপোজার ব্যবহার করতে হয় । ফলে, নেগেটিভের ঘনত্ব, ডেনসিটিও হয় ভিন্ন ভিন্ন । তাই, যদি আমরা একই লাইট নম্বর দিয়ে কোন ছবির সম্পূর্ণ নেগেটিভটা প্রিন্ট করি, তবে বাঞ্ছিত ফল পাবো না ।

এনালাইজার এবং প্রিন্টিং মেসিনের যে সংখ্যাগুলো দিয়ে আলো নিয়ন্ত্রণ করে প্রিন্টের, পজিটিভের ঘনত্ব এবং রঙের ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণক্রম কমানো-বাড়ানো, নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেই সংখ্যাগুলোকে বলে ‘লাইট নম্বর’ বা ‘প্রিন্টার পয়েন্ট’ ।

আধুনিক প্রিন্টিং মেশিনে (Bell & Howell Moduler) সাধারণত এক থেকে পঞ্চাশ (১-৫০) পর্যন্ত প্রিন্টিং লাইট বা প্রিন্টার পয়েন্ট থাকে। অর্থাৎ এক্সপোজারের মান এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রিন্টার পয়েন্টের ‘লগ এক্সপোজারের মান ০.০২৫’, এবং ক্যামেরার পূর্ণ অ্যাপারচারের ‘লগ এক্সপোজারের মান ০.৩’—সুতরাং ০.০২৫ $\times$ ১২ = ০.৩—এটা প্রমাণ করে যে একটা প্রিন্টার পয়েন্ট ক্যামেরার পূর্ণ অ্যাপারচারের $^{১}/_{১২}$ অংশ। এই প্রসঙ্গে আরও যা উল্লেখযোগ্য, ধরে নিতে হবে নেগেটিভ ‘গামা-০.১ পর্যন্ত ডেভেলপ করা হবে। কিন্তু আধুনিক রঙিন নেগেটিভ ‘গামা-০.৬৫ পর্যন্ত ডেভেলপ করা হয়। ফলে, কার্যক্ষে ত্রে একটা প্রিন্টার পয়েন্টের মান দাঁড়াচ্ছে ক্যামেরার পূর্ণ অ্যাপারচারের $^{১}/_{৮}$ অংশ । অর্থাৎ আটটা প্রিন্টার পয়েন্ট বা লাইট নম্বরের সমান একটা পূর্ণ অ্যাপারচার।

সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক এক্সপোজ করা নেগেটিভ প্রিন্ট করার জন্য লাল—২৫, নীল—২৫, সবুজ—২৫ প্রিন্টার পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। এই জন্যই খুব স্বাভাবিক কারণে এক স্টপ ওভার বা আন্ডার এক্সপোজড করলে এক স্টপ ওভার নেগেটিভের জন্য লাল—৩৩, নীল—৩৩, সবুজ—৩৩ এবং এক স্টপ আন্ডার নেগেটিভের জন্য লাল—১৭, নীল—১৭, সবুজ—১৭ প্রিন্টার পয়েন্ট বা লাইট নম্বর ব্যবহার করা হয়।

প্রিন্টিং মেশিন আর এক ভাবেও প্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা করে। এই পদ্ধতির নাম—‘ট্রিম’। এই পদ্ধতিতে লাল—২৪, নীল—২৪, সবুজ—২৪, প্রিন্টিং লাইট ব্যবহার করা হয় স্বাভাবিক নেগেটিভের জন্য। মূলত এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সার্বিক রং নিয়ন্ত্রণ করা হয় যখন নূতন ইমালশান কিংবা নূতন ব্যাচ নম্বরের ফিল্ম ব্যবহার করা হয়।

সাদা-কালো প্রিন্টিং মেসিনে এক (১) থেকে বাইশ (২২) পর্যন্ত লাইট নম্বর থাকে ।

গ্রেডিং এবং প্রিন্টিং-এর ক্ষে ত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘নেগেটিভ ডেনসিটি’। সাধারণ ভাবে নেগেটিভ ডেনসিটি বলতে বোঝায়—এক্সপোজার এবং ডেভেলপমেন্টের ফলে ফিল্মের উপর কতটা ‘সিলভার’ জমা হয়েছে তার পরিমাণকে। তবে ডেনসিটি সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ধারণা হবে যদি আমরা এই প্রসঙ্গে ‘ট্রানস্‌মিশান’ এবং ‘অপাসিটি’ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করি। এটা আমরা সাধারণ ভাবেই বুঝতে পারি ডেনসিটি কম হলে নেগেটিভ পাতলা এবং ডেনসিটি বেশি হলে নেগেটিভ পুরু হবে। ফলে কম ডেনসিটির নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে বেশি আলো এবং বেশি ডেনসিটির নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে

কম আলো যেতে পারে। অর্থাৎ প্রিন্টের ক্ষেত্রে কম ডেনসিটির বা আন্ডার নেগেটিভের জন্য কম লাইট নম্বর এবং বেশি ডেনসিটির বা ওভার নেগেটিভের জন্য বেশি লাইট নম্বর ব্যবহার করতে হয়। ট্রানস্‌মিশান, অপাসিটি এবং ডেনসিটির সম্পর্ক নিম্নরূপ—

ট্রানস্‌মিশান	—	অপাসিটি	—	ডেনসিটি
১/১০		১০		লগ ১
১/১০০		১০০		লগ ২
১/১০০০		১০০০		লগ ৩

অর্থাৎ—

১০	=	১০ ১	=১০=	লগ ১
১০০	=	১০ ১০	=১০	= লগ ২
১০০০	=	১০ ১০ ১০	=১০	= লগ ৩

সেনসিটোমেট্রির ভাষায়, যে পরিমাণ আলো নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং যে পরিমাণ আলো নেগেটিভের উপর ফেলা হয়েছে তার অনুপাতকে 'ট্রানস্‌মিশান একক' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ট্রানস্‌মিশনেরই বিপরীত অবস্থান হলো অপাসিটি। অপাসিটির লগারিদমকে 'ডেনসিটি একক' দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

এনালাইজার মেসিন আবিষ্কারের আগে প্রিন্টার এবং সিনেমাটোগ্রাফার এক সঙ্গে বসে নেগেটিভ দেখে তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আনুমানিক 'লাইট নম্বর' নির্বাচন করে একটা রাশ প্রিন্ট করতেন এবং এই পরীক্ষামূলক রাশ প্রিন্টের ফলাফল অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রিন্ট করা হতো সিনেমাটোগ্রাফারের পরামর্শে।

এনালাইজার মেশিন আবিষ্কার হবার পর থেকে প্রথমে 'ওয়ান লাইট' প্রিন্টের মাধ্যমে রাশ প্রিন্ট করা হয় এবং রাশ প্রিন্টের ফলাফল দেখে 'অ্যানসার প্রিন্ট', অর্থাৎ প্রথম রিলিজ প্রিন্ট করা হয়। বিভিন্ন কারণে প্রতিটি প্রিন্টের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সংশোধন করতে হয় বাঞ্ছিত ফলের জন্য। 'ওয়ান লাইট প্রিন্ট' বলতে বোঝায় সমস্ত নেগেটিভটাকে লাল-নীল-সবুজ '২৫-২৫-২৫' লাইট নম্বরে রাশ প্রিন্ট করা। রাশ প্রিন্ট হয়ে যাবার পর প্রিন্টার এবং সিনেমাটোগ্রাফার এক সঙ্গে এনালাইজারে বসে গ্রেডিং-এর কাজ শুরু করেন।

এনালাইজারের নেগেটিভ ক্যারিয়ারে নেগেটিভ ঢুকিয়ে দিয়ে এনালাইজার চালু করলেই এনালাইজার মনিটর, আদতে একটা টিভির পর্দায়, নেগেটিভের রূপ ভেসে ওঠে '২৫-২৫-২৫' লাইটের পরিপ্রেক্ষিতে পজিটিভের যে রূপটা আমরা রাশ প্রিন্টে দেখেছি। এই বার সিনেমাটোগ্রাফার তাঁর বাঞ্ছিত রূপ প্রকাশের জন্য লাইট নম্বর নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক 'লাইট', প্রিন্টিং লাইট নির্বাচন করবেন। এবং পরবর্তী প্রিন্টের সময় এই 'নব নির্বাচিত' লাইট নম্বর' প্রিন্টিং লাইট অনুসরণ করে প্রিন্ট করা হয়।

গ্রেডিং-এর সময় কয়েকটা বিষয় বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হয়।

সিনেমাটোগ্রাফারের দিক থেকে ভাবতে হয়—

১। নেগেটিভের প্রকৃতি।

২। পজিটিভ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৩। ল্যাবের বৈশিষ্ট্য।

চিফ টেকনিশিয়ান এবং প্রিন্টারকে ভাবতে হয়—

১। নেগেটিভের প্রকৃতি।

২। পজিটিভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ।
৩। ল্যাবের নিজস্বতা ।
৪। সিনেমাটোগ্রাফারের বৈশিষ্ট্য এবং চাহিদা ।

সাদা আলো বা রঙ = ৩০% লাল + ১১% নীল + ৫৯% সবুজ রঙের মিশ্রণ।
লাল রঙ ২৫%, নীল রঙ ১৫%, সবুজ রঙ ১৫% আলো প্রতিফলিত করে ।

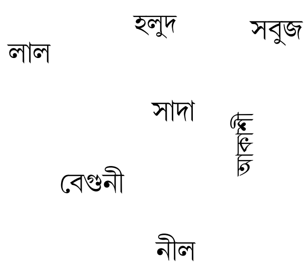

অ্যাডেটিভ মিশ্রণ

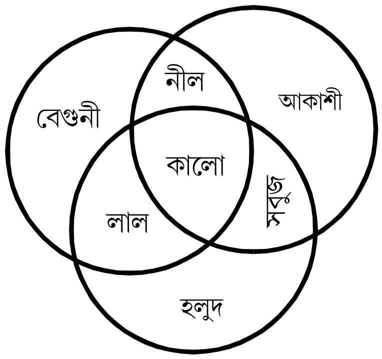

সাবট্রাকটিভ মিশ্রণ

রঙিন লাইট	**লাইট ন[illegible] এবং তার প্রতিক্রিয়া**
+ লাল	ঃ [illegible] সবুজ)
- লাল	ঃ [illegible] নীল এবং হাল্কা হবে ।
+ নীল	ঃ হলুদ [illegible] + সবুজ)
- নীল	ঃ হলুদ ভাব কমবে । একটু নীল এবং হাল্কা হবে
+ সবুজ	ঃ লাল ভাব বাড়বে (সবুজ + নীল)
- সবুজ	ঃ লাল ভাব কমবে । একটু সবুজ এবং হাল্কা হবে ।
+ লাল + নীল	ঃ সবুজ ভাব বাড়বে ।
+ লাল + সবুজ	ঃ নীল ভাব বাড়বে ।
+ নীল + সবুজ	ঃ লাল ভাব বাড়বে ।
+ লাল + নীল + সবুজ	ঃ সব রঙের ঘনত্ব বাড়বে । কালচে হবে ।
- লাল - নীল - সবুজ	ঃ সব রঙের ঘনত্ব কমবে । সাদাটে হবে ।

॥ ফ্রেম ॥

ফ্রেম, ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখা প্রকৃতির নির্বাচিত অংশ। শূন্যতা বনাম আকৃতি—বিশেষ মুহূর্তের মানসিক আবেগ-অনুভূতির জ্যামিতিক প্রকাশ। জ্যামিতিক আকৃতি—শব্দ, ভাষা, প্রতীক, চিহ্ন, চিন্তার অভিব্যক্তি ফ্রেম।

বিভিন্ন রকম আকৃতি—দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে চলচ্চিত্রের, ক্যামেরার ফ্রেম। ফ্রেমের আকারে যত বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, ফ্রেম আসলে শূন্যতাকে রূপদান। দৃষ্টির দায়বদ্ধতা। জ্যামিতিক আকৃতি অর্থে ভাষা। ফ্রেম আকৃতি-নিরপেক্ষ। বন্ধনেই আকৃতির মুক্তি। রূপকে অতিক্রম করে রূপাতীত আর্তি। সীমাবদ্ধতার মধ্যে অসীমে প্রকাশ।

প্রকৃতির দৃষ্টিনন্দন আকৃতির মধ্যে অতি প্রাচীন কালেই গ্রীক শিল্পীরা একটা বিশেষ অনুপাত লক্ষ্য করে শিল্প সৃষ্টিতে সেটা প্রয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতির এই দৃষ্টিনন্দন আকৃতির অনুপাতের গাণিতিক সূত্র অনুধাবন করে পরবর্তীকালে শিল্পচর্চায় গড়ে উঠেছে 'গোল্ডেন সেকশন' বা 'আদর্শ অনুপাত'। বিশেষ করে গ্রীক শিল্পী ফাইভিয়াস-এর মূর্তির রূপ, আকৃতি বিন্যাসে এই আদর্শ অনুপাতের প্রয়োগ লক্ষ্য করে বর্তমান শতকের মার্কিন গণিতজ্ঞ মার্কবার এই অনুপাতের নাম দিয়েছেন—'ফাই'। সংগীতের তাল সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে আশ্চর্য এক গাণিতিক অনুপাত-এর রহস্য। মনে করা যাক, একটা রেখা 'কখ' এবং 'কখ' রেখাকে 'গ' দিয়ে ভাগ করা হলো। তাহলে আদর্শ অনুপাত হবে, কখ/গখ = গখ/কখ = ০·৬১৮০৩

ফ্রেম সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম পদক্ষে প ফ্রেম বিভাজন। ফ্রেমকে প্রথমে আমরা দু'টো অনুভূমিক এবং দু'টো উল্লম্ব রেখা দিয়ে 'নয়' ভাগে ভাগ করবো। লক্ষ্যণীয়, এই বিভাজনের ভিত্তিও কিন্তু 'সোনালী অনুপাত' (গোল্ডেন রেশিও)। এবং সরল রেখাগুলো ফ্রেমের মধ্যে পরস্পরকে যে চারটি বিন্দুতে ছেদ করেছে তাকে বলে 'সোনালী বিন্দু' (গোল্ডেন পয়েন্ট)। আলোকচিত্রের পরিভাষায় এই ফ্রেম-বিভাজনকে বলে 'ক্রস হেয়ারস'। সোনালী অনুপাতের উৎপত্তি—গতি, ভারসাম্য এবং মনস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাত, মিথষ্ক্রিয়া।

শূন্যতাকে আকৃতি দান করে ফ্রেম। আবার ফ্রেম নিজেই শূন্যতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে শূন্যতাকে ফ্রেমবদ্ধ করে। ফ্রেমবদ্ধ শূন্যতা এবং আকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে, মিথষ্ক্রিয়ার টানাপোড়েনে সৃষ্টি হয় আবেগ, অভিব্যক্তি-ভাষা। ফ্রেমের ভাষা।

বলা বাহুল্য, শূন্য ফ্রেম শূন্যতারই দ্যোতক। কিন্তু যে মুহূর্তে ফ্রেমের মধ্যে একটা বিন্দু স্থাপন করা হলো, শুরু হয়ে গেল অস্তিত্ব সংকট, টানাপোড়েন। বন্দী মুক্তির দাবীতে সোচ্চার ফ্রেমবদ্ধ বিন্দু। লক্ষ্যণীয়, আমি বলছি বিন্দু, শূন্য নয়। বিন্দুর অস্তিত্ব অনড়, গতিহীন, স্থবির, কিন্তু কেন্দ্র, শক্তির উৎস। শূন্য অর্থে বৃত্ত, অসীমতায় সীমাবদ্ধ অবস্থান। বিন্দুর দৃষ্টিকোণ থাকে অস্তিত্বহীন। শূন্যের কেন্দ্রে অবস্থান করে বিন্দু। কেন্দ্রবিন্দু। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আর এক দর্শন, তন্ত্র-ভুবন। ফ্রেমবদ্ধ কেন্দ্রবিন্দু অনড়-গতিরোধকারী, কিন্তু তীব্র আকর্ষক। এবার কেন্দ্রবিন্দুকে আমরা যদি ফ্রেমের অন্য যে কোন সোনালী বিন্দু বা গোল্ডেন পয়েন্টে উপস্থাপন করি সংগে সংগে ফ্রেমের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে অদ্ভুত এক টানাপোড়েন।

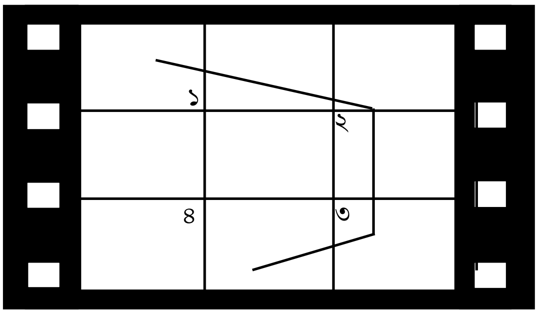

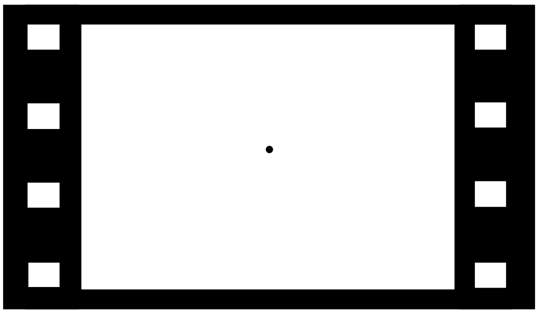

ফ্রেম এবং কম্পোজিশন সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের চোখের অবস্থান এবং মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । মূলত এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করেই যাবতীয় দৃশ্যযোগ্য বিষয়ের আলোচনা(তত্ত্ব গড়ে উঠেছে ।

আমাদের চোখের একই সমান্তরাল অক্ষে অবস্থানে দিগন্তরেখা নয়নাভিরাম এবং সদা প্রসরমান । তদুপরি, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি আমাদের চোখের গতি, দৃষ্টি ‘বাঁ-দিক’ থেকে ডানদিকে গতিশীল । যেহেতু আমাদের চোখ ফ্রেমের বাঁ-দিক থেকে দেখতে শুরু করে, তাই মনে করা যাক বিন্দুকে আমরা ফ্রেমের বাঁ-দিকে, ৪নং চিহ্নিত স্থানে স্থাপন করলাম । সংগে সংগে সৃষ্টি হলো আমাদের চোখের সম্মুখ গতি । সমস্ত ফ্রেম হয়ে উঠল আকর্ষক । বিন্দু পেল সামনে এগিয়ে যাবার অনেকটা পথ । গতির উপশম । এবার বিন্দুকে আমরা যদি ফ্রেমের ডানদিকে ৩নং চিহ্নিত স্থানে স্থাপন করি, তাহলে আমাদের চোখের সম্মুখ গতি হবে, এবং ফ্রেমের বাঁদিকের অংশ আকর্ষণ হারাবে। কেননা, আমাদের চোখের গতি বাঁদিক থেকে ডানদিকে ক্রম-অগ্রসরমান । কিন্তু ৩নং বিন্দু থেকে এগিয়ে আমাদের দৃষ্টি ফ্রেমের ডান দিকে দেওয়ালে বাধা পাবে।

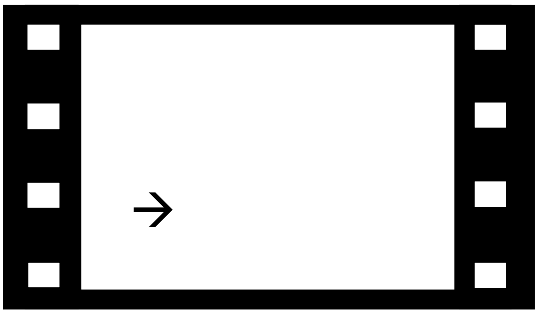

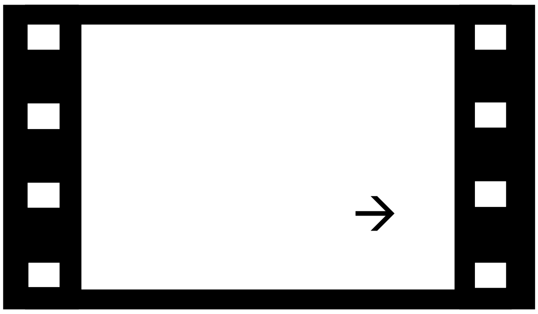

এবার আমরা যদি বিন্দুকে ১নং চিহ্নিত স্থানে স্থাপন করি, তবে আমাদের দৃষ্টি ডানদিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু অভিকর্ষের স্বাভাবিক টানে নিম্নমুখী হবে । আবার বিন্দুকে ২নং চিহ্নিত স্থানে স্থাপন করলে ফ্রেমের বাঁদিকের অংশ আকর্ষণ হারাবে । এবং স্বাভাবিক কারণেই গতি নিম্নমুখী হবে ।

ফ্রেমের মধ্যে সমান্তরাল দিগন্তরেখাকে আমরা যদি একটু তির্যক করি সংগে সংগে শুরু হয়ে যায় অদ্ভুত এক টানাপোড়েন। দিগন্তরেখার তির্যক অবস্থানের সংগে সংগেই শুরু হয় প্রকৃতির অন্বেষণে প্রকৃতিরই বিরুদ্ধাচরণ । যার থেকে উদ্ভূত হয় এক বিচিত্র গতি । ঘাত-প্রতিঘাতের মিথষ্ক্রি(য়া—ভাষা । সংকেত।

১নং এবং ২নং বিন্দু উভয়ে যদি কেন্দ্রমুখী হয়, তবে ফ্রেমের মধ্যে সৃষ্টি হবে তীব্র তির্যক গতি । সমস্ত ফ্রেম হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় । একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে ৩নং এবং ৪নং চিহ্নিত স্থানের বিন্দু যদি কেন্দ্রাভিমুখী হয় । লক্ষ্যণীয়, প্রথম ক্ষে ত্রে বিন্দুর আকৃতি ক্রমে বড় এবং স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং গতিও বৃদ্ধি পাবে । কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষে ত্রে বিন্দু যেন ক্রমে ছোট হতে হতে অস্তিত্ব হারাচ্ছে, গতিও কমবে । এবং অস্পষ্ট হয়ে যাবে ।

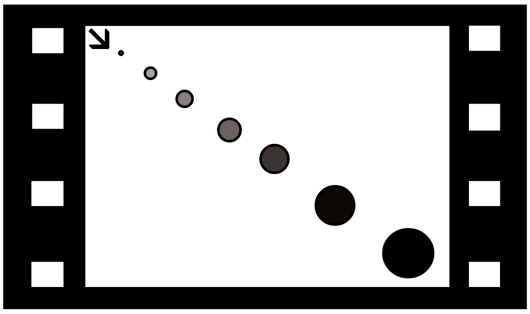

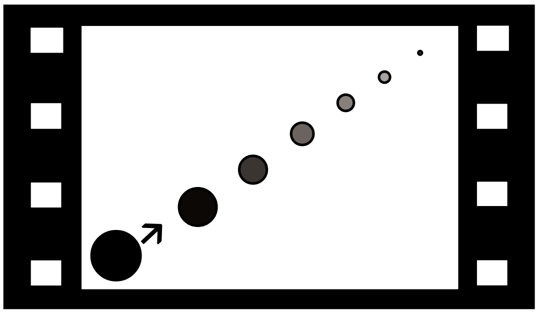

এবার আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো ফ্রেমের এই জ্যামিতিক বিন্যাস এবং মনস্তত্ত্ব কীভাবে ছবির ভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছে। রাজাকে আপনি ফ্রেমের কোথায় উপস্থাপন করবেন ? যেমন চালচিত্রের কেন্দ্র দুর্গাপ্রতিমা । সাধারণভাবে ফ্রেমের মধ্যবর্তী চরিত্রই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং আকর্ষক, কিন্তু দৃষ্টির গতিরোধকারী ।

'ক'-'খ'-কে তাড়া করেছে । 'ক'-কে ফ্রেমের ১নং বা ৪নং চিহ্নিত স্থানে রেখে ক্যামেরা প্যান বা ট্রাকিং করছে । সামনে থাকবে ফ্রেমের দুই-তৃতীয়াংশ । দৃষ্টি পাবে গতির আনন্দ । এই পরিপ্রেক্ষি তে 'খ'কে ক্যামেরা ফ্রেমের ২নং বা ৩নং চিহ্নিত স্থানে রেখে প্যান বা ট্রাকিং করবে । ফলে 'খ'-এর পিছনে থাকবে ফ্রেমের দুই-তৃতীয়াংশ । দর্শকের বারবার মনে হবে এই বুঝি 'ক' ফ্রেমের বাঁদিক দিয়ে ঢুকে 'খ'-কে পিছন দিক থেকে ধরে ফেলবে । যেহেতু 'খ'-এর সামনের দিকে থাকবে ফ্রেমের এক-তৃতীয়াংশ, তাই আমাদের দৃষ্টি সামনের দিকে এগোতে না পেরে 'খ'-এর পিছনের দিকে ছুটবে মনস্তাত্ত্বিক কারণে । কারণ, 'খ'-এর পিছনে ছুটে আসছে তো 'ক'। যার আকর্ষণ অদৃশ্য ।

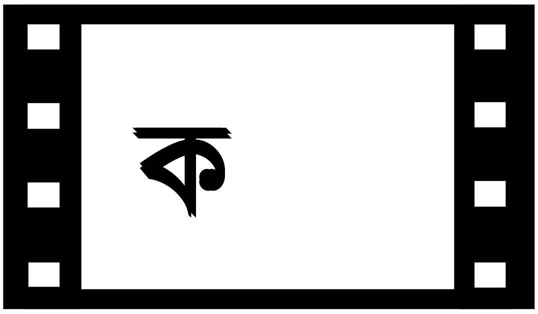

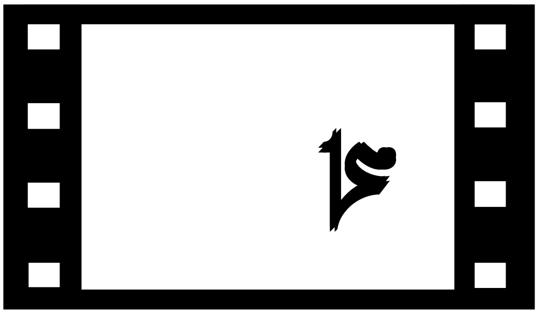

'ক' খুব অসহায় । 'খ'-কে ধরা গেল না আজ । কিন্তু যাবে কোথায় ? কোথায় পালাবে ? একদিন না একদিন ধরা পড়বেই। এই অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য 'ক'-এর মুখ থাকবে ফ্রেমের বাঁদিকের নীচে, কোণে, ডানদিকে তাকিয়ে ।

'খ'ও খুব অসহায় । '—আজ না হয় 'ক'-এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, কিন্তু একদিন না একদিন তো ধরা পড়তেই হবে। কোথায় পালাবে ? আধুনিক পৃথিবী যে খুব ছোট । আমার লুকাবার জন্য একটাও নিরাপদ জায়গা নেই এই পৃথিবীতে!' এই মনোভাব কি অনুভূত হবে যদি 'খ' থাকে ফ্রেমের একেবারে ডান কোণের নীচে, ডান দিকে তাকিয়ে ? লক্ষ্যণীয়, 'ক'-এর সামনে আশা, ফ্রেমের শূন্যাংশ, 'খ'-এর সামনে অন্ধকার, 'খ'-এর পিছনে ফ্রেমের শূন্যাংশ। ফ্রেমের চরিত্রের সামনের শূন্যাংশ আশা, পিছনের শূন্যাংশ হতাশা । ফ্রেমের দুই-তৃতীয়াংশের আকর্ষণ বেশী, এবং এক-তৃতীয়াংশের আকর্ষণ কম(স্বাভাবিকভাবেই আকৃতির পরিমাণজাত কারণে । বৈপরীত্যে, দ্বন্দ্বে এবং সংঘাতে । প্রাপ্তির আনন্দের সংবাদ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিছু করার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য চরিত্ররা ফ্রেমের পশ্চাৎভাগ থেকে অগ্রভাগে এগিয়ে আসবে কোনাকুনিভাবে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা হবে চরিত্ররা যদি ফ্রেমের অগ্রভাগ থেকে পশ্চাৎভাগে কোনাকুনি ধাবিত হয়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায় । এইভাবেই ক্যামেরার

ফ্রেম নিজের ভাষায় কথা বলে গতির সমন্বয়ে, চলচ্চিত্রের ভাষায় ।

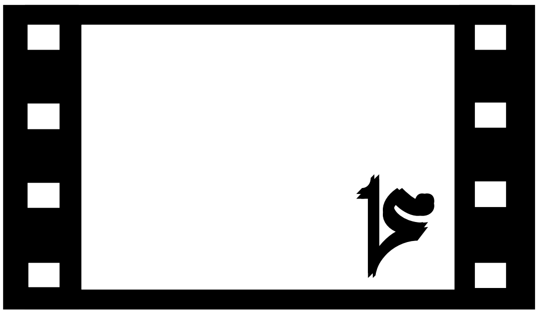

এই আলোচনাতে ফ্রেমের আকৃতি, জ্যামিতি, শূন্যতা, বিস্তার, ভারসাম্য, গতি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের কম্পোজিশন । চলচ্চিত্রে ফ্রেমের আকৃতির সংগে আলো-ছায়া, বর্ণ, ফোকাস এবং শব্দ যুক্ত হয়ে ফ্রেম পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা । গতি ও দৃষ্টিকোণের ঘাত-প্রতিঘাত এবং বৈচিত্র্যের অনন্যতা । চলচ্চিত্রের নিজস্ব জগৎ—স্বতন্ত্র ভাষা।

।। কম্পোজিশন ও চলচ্চিত্রের ভাষা ।।

ফোটোগ্রাফার মেয়ব্রীজ আর ইঞ্জিনিয়র ইজ্যাক স্থির আলোকচিত্রে গতি সঞ্চার করে 'হর্স ইন মোশান' ছবি তুলে এবং সেটা দেখানোর জন্য 'প্রজেকটার' তৈরী করে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তারই সর্বাধুনিক রূপ চলচ্চিত্র । মূলত চলচ্চিত্র কতকগুলি অবিচ্ছিন্ন স্থির আলোকচিত্রের নিটোল গতি প্রবাহ । যদিও আলোকচিত্র, নাটক, চলচ্চিত্রের আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তথাপি নাটক, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের মূল সূত্র—চিত্রশিল্পের কাম্পোজিশনের নিয়ম-কানুনের উপরেই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ।

চলচ্চিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত । তথাপি নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা আর চলচ্চিত্রের দৃশ্য পরিকল্পনার নিয়মগুলি মূলত একই । উল্লেখযোগ্য, নাটকের দৃষ্টিকোণ একটাই, কিন্তু চলচ্চিত্র ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা একাধিক স্থির চিত্রের ধারাবাহিক নিটোল গতি প্রবাহ । নাটক এবং চলচ্চিত্রের প্রভেদ নির্ণয়ে মঞ্চের আদল ছাড়া আরও যা লক্ষ্যণীয়, সেকেণ্ডে ২৪টা (চব্বিশ) ফ্রেমের আবর্তনের নাটকীয়তা এবং অন্ধকারে একটা প্রায় অদৃশ্য ছেদ দিয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার প্রক্রিয়া (বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম 'দৃষ্টির ক্রমান্বয়তা'—Persistence of Vision । এই ক্ষে ত্রে বৌদ্ধদর্শনের অনন্তপ্রদীপ শিখার ব্যাপারটা স্মরণীয় । চলচ্চিত্রের ক্ষে ত্রে 'দৃষ্টিকোণ' এবং 'ধারাবাহিক শব্দ দুটোর অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেই বোঝা যাবে নাটকের দৃশ্য বিন্যাস আর চলচ্চিত্রের দৃশ্য বিন্যাসের মিল এবং পার্থক্য কোথায় ।

ফ্রেমের মধ্যে ছবির বিষয়বস্তু, চরিত্র সাজানো, উপস্থাপন প্রক্রিয়াকে বলে কম্পোজিশন । কম্পোজিশন ব্যাপক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া । শিল্পী বক্তব্য প্রকাশে ফ্রেমের মধ্যে ছবির ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করে সুর-ছন্দ-গতি । কম্পোজিশনের ক্ষে ত্রে প্রধান বিচার্য বিষয়—ফ্রেমের মধ্যে কী থাকবে, আর কী থাকবে না ।

সর্বকালে, সর্বদেশে সৌন্দর্য প্রকাশের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম-কানুন আছে । এই বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি নিছক বলপূর্বক প্রযুক্ত না । এর পেছনে কাজ করছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি । আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—

১। চোখের গতিপথ ২। আলোছায়ার খেলা, রঙ এবং বর্ণ বিন্যাস ৩। বিষয়বস্তুর আকার ৪। ভারসাম্য ৫। ফোকাস ৬। দৃষ্টিকোণ এবং মানসিক অনুভূতি ।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, ফ্রেমের আলোকিত অংশ আকর্ষণীয় । স্মরণীয়, মঞ্চের আলোক সম্পাত প্রক্রিয়া এবং পেইন্টিং-এর ডেপ্‌থ্‌, ডাইমেনশনের বিষয় । ফ্ল্যাট ছবি দেখতে আমাদের ভালো লাগে না । ফ্রেমের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগের পার্থক্য বোঝা যায় না । এই ক্ষে ত্রে বিচার্য ফিল্মের এবং পর্দার 'দ্বি-মাত্রিক' আকার ।

ফ্রেমে সাধারণত কোন বিষয়বস্তু এবং চরিত্র গুরুত্ব অনুযায়ী উপস্থাপন করতে দেখা যায় । ফ্রেমের মধ্যে বড় বা প্রধান বিষয়বস্তু বা চরিত্রকে ছোট বা সাধারণ বিষয়বস্তু বা চরিত্র দিয়ে 'সী-স' খেলার মত ভারসাম্য রক্ষা করা হয়ে থাকে। চরিত্র বা বিষয়বস্তু ছাড়া 'ফোকাস' এবং 'টোন' নিয়ন্ত্রণ করেও ফ্রেমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় । ফ্রেমে স্পষ্ট ফোকাস, বিষয়বস্তু বা চরিত্র গুরুত্ব পায় । ফ্রেমের সব বিষয়বস্তু বা চরিত্র ফোকাস থাকলেও ক্যামেরার কাছের বিষয়বস্তু বা চরিত্র আকারে একটু বড় এবং গাঢ় রঙের হয় এবং দূরের বিষয়বস্তু বা চরিত্রগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট এবং হাল্কা রঙের হতে হতে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। প্রসঙ্গত—মঞ্চের 'আপার ডেক' ও 'লোয়ার ডেক' এবং 'আপ ও ডাউন' স্টেজের বিষয় বিচার্য।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ এবং মানসিক অনুভূতি । ক্যামেরার নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণে

তোলা ছবি এবং ফ্রেমে চরিত্রগুলির বিশেষ অবস্থান দর্শকের মনে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে । একটা 'লো-অ্যাঙ্গেল' শট চরিত্রে বলিষ্ঠতা আরোপ করে, আবার 'হাই-অ্যাঙ্গেল' শট চরিত্রের অসহায়তা প্রকাশ করে । ফ্রেমে চলমান বিষয়বস্তু বা চরিত্রের সমান বেশী জায়গা না থাকলে দৃষ্টি ফ্রেমের বাইরে চলে যায় । যে বিষয়বস্তু বা চরিত্রগুলি একই অনুভূতি প্রকাশ করে কিংবা এক জাতীয়, তাদের ফ্রেমে অনুভূমিক, উল্লম্ব, কোনাকুনি ভাবে উপস্থাপন করা হয় । ফ্রেমের মধ্যে বিপরীত মনোভাব সৃষ্টি করে বিষয়বস্তু বা চরিত্রের পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান । আবার ফ্রেমের মধ্যে ত্রিভুজাকৃতি অবস্থান দ্বান্দ্বিক । ফ্রেমে বৃত্তাকার অবস্থান ধারাবাহিক একই অনুভূতি সৃষ্টি করে । ফ্রেমের চরিত্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দু'টো চরিত্রের মধ্যে কোনও কিছুর অবস্থান । শূন্য ফ্রেমে চরিত্রের বিপরীতমুখী, পিছন ফিরে, 'ব্যাক টু ক্যামেরা' থাকা কী ভাব- ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' এবং 'পিকু' ছবিতে । উল্লেখযোগ্য, উভয় ছবি শুরু হয়েছিল ফ্রেমের মধ্যে প্রধান চরিত্রের বিপরীতমুখী—'ব্যাক টু ক্যামেরা' অবস্থানের শট দিয়ে । এর ঠিক বিপরীত ভাব-ব্যঞ্জনাই প্রকাশ পাবে যদি আমরা দেখি প্রধান চরিত্র 'ব্যাক টু ক্যামেরা' জনগণ বা তার অধীনস্থ লোকজনকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে ।

মূলত সমগ্র কম্পোজিশন প্রক্রিয়া সংঘাতের দ্বান্দ্বিক সূত্রে নিয়ন্ত্রিত । কম্পোজিশনের অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলি ঃ—

১। আয়তনের সংঘাত ২। স্থানের সংঘাত ৩। দৃষ্টিকোণের সংঘাত ৪। আলোর সংঘাত ৫। ফোকাসের সংঘাত ৬। শব্দের সংঘাত ৭। গতি হারের সংঘাত ।

আগেই বলেছি, কিছু প্রচলিত ধারার কম্পোজিশন 'ঐতিহ্যবাহী ক্লাসিক' সেপ আমাদের সহজেই আকর্ষণ করে শারীরিক এবং মানসিক কারণে । লক্ষ্যণীয়, প্রচলিত সেপগুলি বিশিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি ইংরাজী অক্ষরের মত ।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য লেখার সঙ্গে সঙ্গেই ছবির কম্পোজিশন শুরু হয়ে যায় । চিত্রনাট্যে, চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক যে ভাব সৃষ্টি করেন, ছবি তৈরির সময় সেই ভাব অনুযায়ী ফ্রেমের মধ্যে চরিত্র কম্পোজ করা হয় । চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের সঙ্গে চিত্র, স্থির আলোকচিত্র এবং নাটকের দৃশ্যবিন্যাসের মিল থাকলেও চলচ্চিত্রে যুক্ত হয়েছে বিশেষ মাত্রা—গতি এবং ক্যামেরা, ক্যামেরার অসংখ্য দৃষ্টিকোণ । যা চলচ্চিত্রকে দিয়েছে অনন্য বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্য । যার আছে নিজস্ব বিজ্ঞান এবং ভাষা ।

চলচ্চিত্রের দৃশ্য পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিচালকের অধীন । কম্পোজিশন নির্ভর করে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ট্রিটমেন্টের উপর । যার কোন বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন নেই । স্থির আলোকচিত্র যেখানে একটা গতিময় মুহূর্তকে অনন্ত মুহূর্তে পরিণত করে, চলচ্চিত্র ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গতিময় মুহূর্তকে উপস্থাপন করে রূপালী পর্দায় । স্থির আর গতিময়তার এই যে দ্বন্দ্ব, এই বৈপ্লবিকতার মধ্যেই নিহিত আছে চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের নিজস্ব সত্তা, বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য । আর এই বৈপ্লবিকতায় চিত্র, স্থির আলোকচিত্র এবং নাটকের কম্পোজিশনের যুক্তি-সম্মত সমন্বয়, সিনথেসিস রূপ এবং তাকে অতিক্রম করেও আরও কিছু ।

কেন আরও কিছু ?

চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনে গতি সৃষ্টি হয় নানা ভাবে । ফ্রেমের চরিত্রের সচলতায়, ক্যামেরার সচলতায়, ট্রলি ও ক্রেন, জুমলেন্সের কার্যকারিতায় এবং শব্দের অভিঘাতে । এবং এগুলির সমন্বিত প্রয়োগে । মিলনে, সংঘাতে, মিথষ্ক্রিয়ায়। যেমন 'চারুলতা' থেকে —

'ভূপতি বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসে, তার হাতে একটা মোটা বই । বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে চারুর কাছে এসে যায় । তারপর ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে একটা পাতা ওল্টায় । তারপর চারুকে লক্ষ্য না ক'রে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় । চারু স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে । ভূপতির আকার ক্রমশ ছোট হয়ে আসে । খেলার ছলে চারু হাতের অপেরা গ্লাসটা তুলে চোখের সামনে ধরে । ভূপতি এখন খুব কাছে, কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য মাত্র । তারপর সে ডান দিকে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৃশ্যের বাইরে চলে যায় । চারু ভ্রূকুঞ্চিত করে ।

এবার অপেরা গ্লাস-সমেত তার হাতটা দ্রুত নিচে নেমে আসে ।'

ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে 'জুম-ব্যাক' করে আগের জায়গায় ফিরে আসে এবং দৃশ্যটাও ফ্রেমকে অতিক্রম করে তৃতীয় মাত্রা পেয়ে যায় । কিছুটা বা বিমূর্ত । কিংবা 'পথের পাঁচালী'র সেই দৃশ্যটা—অপু পানা পুকুরে দুর্গার চুরি করা মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল । পানার মধ্যে জলের আবর্ত সৃষ্টি হলো, আবার আস্তে আস্তে পানার চাপে বৃত্তটা মিলিয়ে গিয়ে আগের অবস্থা ফিরে এলো । উভয় ফ্রেমের প্রসারণ, সংকোচন ও নীরবতা বিশেষ লক্ষ্যণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে । এই প্রসঙ্গে শব্দের অভিঘাতের বিষয় আলোচ্য। 'পথের পাঁচালী' থেকে—পুকুরের জলে মাকড়সার মত পোকাগুলি খেলা করছে। নেপথ্যে রবিশংকরের সেতার । একটা ছন্দের দোলা লাগে । সেতারবিহীন এই দৃশ্যটাই হয়ে যেত নেহাতই মামুলী । ধরা পড়তো না প্রকৃতির ছন্দ । আবার দুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়া যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে, নেপথ্যে তার সানাই বাজে । সত্যজিৎ রায়ের মতে—'কান্নার শব্দে কেমন একটা বীভৎসতা আছে । সেটা পরিহার করার উদ্দেশ্যে এই দৃশ্যে স্বাভাবিক শব্দের বদলে তার সানাই-এর তার সপ্তকে পটদীপ রাগে একটা করুণ সুর বাজানো হয়েছিল । এ যেন কান্নারই সামিল, আমার বিশ্বাস এতে করুণরস ঘনীভূতই হয়েছিল ।'

করুণরস একটু বেশীই ঘনীভূত হয়েছিল । নাটকীয় ! দৃশ্যের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে 'আর্টস্কীম' আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্বাভাবিক ধর্মী ছবিতে এই ধরনের সংগীত কৃত্রিম, আরোপিত । উভয় দৃশ্য সংগতিহীন ভাবে দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

গতিময়তা এবং ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ একান্তভাবেই চলচ্চিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । তাই চলচ্চিত্রের সমগ্র কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা ফ্রেমের কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা হবে বিমূর্ত এবং তা চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব সম্মতও নয় ।

কম্পোজিশন এবং চলচ্চিত্রের ভাষা অনুধাবনের ক্ষেত্রে দুটো উল্লেখযোগ্য ছবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' এবং প্রকাশ ঝাঁর 'দামূল' । সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ছবি দুটি গুরুত্বপূর্ণ । কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে ছবি দুটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, কয়েকটি সিকোয়েন্সে ক্যামেরার ধারাবাহিক (বৃত্তাকার-৩৬০°) সচলতা । বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি'কে বলা চলে ছবির মধ্যে নাটক কিংবা নাটকের মধ্যে ছবি । 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি'র কম্পোজিশন বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে নাটক আর চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের মিল ও পার্থক্য কোথায় এবং চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের স্বরূপ কী ।

চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়, বিস্তৃতি । ফ্রেমের সমান্তরাল ব্যবহার । ফলে, চরিত্রের দৃঢ়তা কিছুটা ব্যাহত হয় । অমিতাভ বচ্চনকে উল্লম্ব ফ্রেমে কম্পোজ করলে যে ব্যঞ্জনা, দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে, সেটা সমান্তরাল ফ্রেম কখনোই সৃষ্টি করতে পারবে না । এই ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সের্গাই আইজেনস্টানের 'ব্যাটলশিপ অফ পেটেমকিন' ছবির ওডেসা সিঁড়ির দৃশ্যটা । যেখানে সমান্তরাল ফ্রেমের দু'দিক কালো করে উল্লম্ব ভাবে ছবি কম্পোজ করা হয়েছিল বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করার জন্য । দৃশ্যটা দৃষ্টি পীড়নকারী । কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট । আরোপিত তো বটেই ।

'মানিকদার ছক কষে এগোনো দারুণ উপকারে লাগতো । বহুবার তো এমনও হয়েছে, মানিকদার কোনও কম্পোজিশন ভাল লাগছে না । মুখের ওপর বলেও দিলাম । মানিকদা এতে রাগ করতেন না । বুঝিয়ে বলতেন, তাঁর ফ্রেমিং ভাঙলে পরের শট কীভাবে ধাক্কা খাবে । আমরা যখন ভাবতাম নির্দিষ্ট কোন শট নিয়ে, উনি তখন ভাবতেন গোটা ছবির ফ্রেমিং।' —সৌমেন্দু রায় ।

এই সমগ্রতাই চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনের, শুধু মাত্র কম্পোজিশনের না, চলচ্চিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য, নিজস্বতা ।

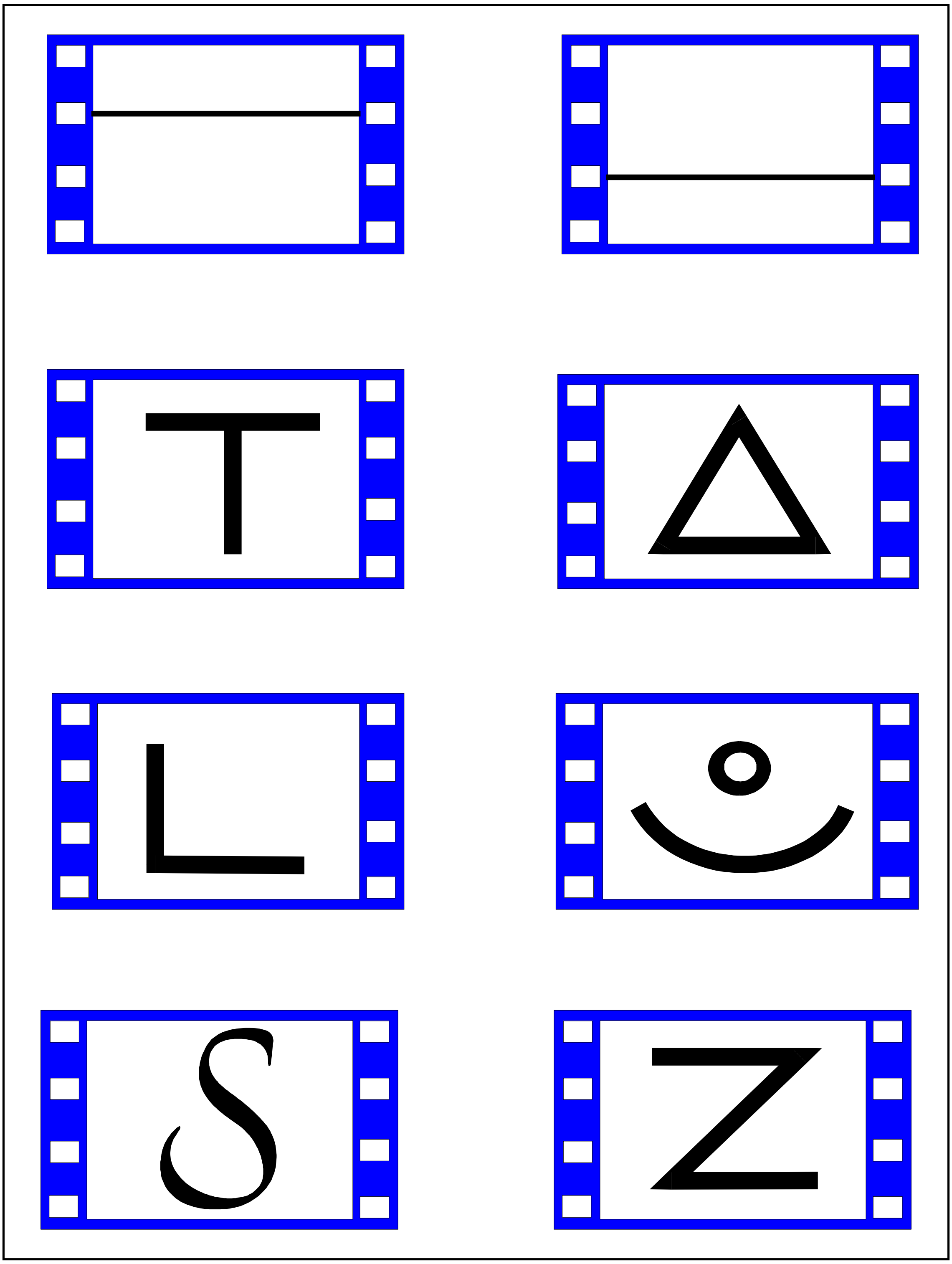
T
L
S
Z

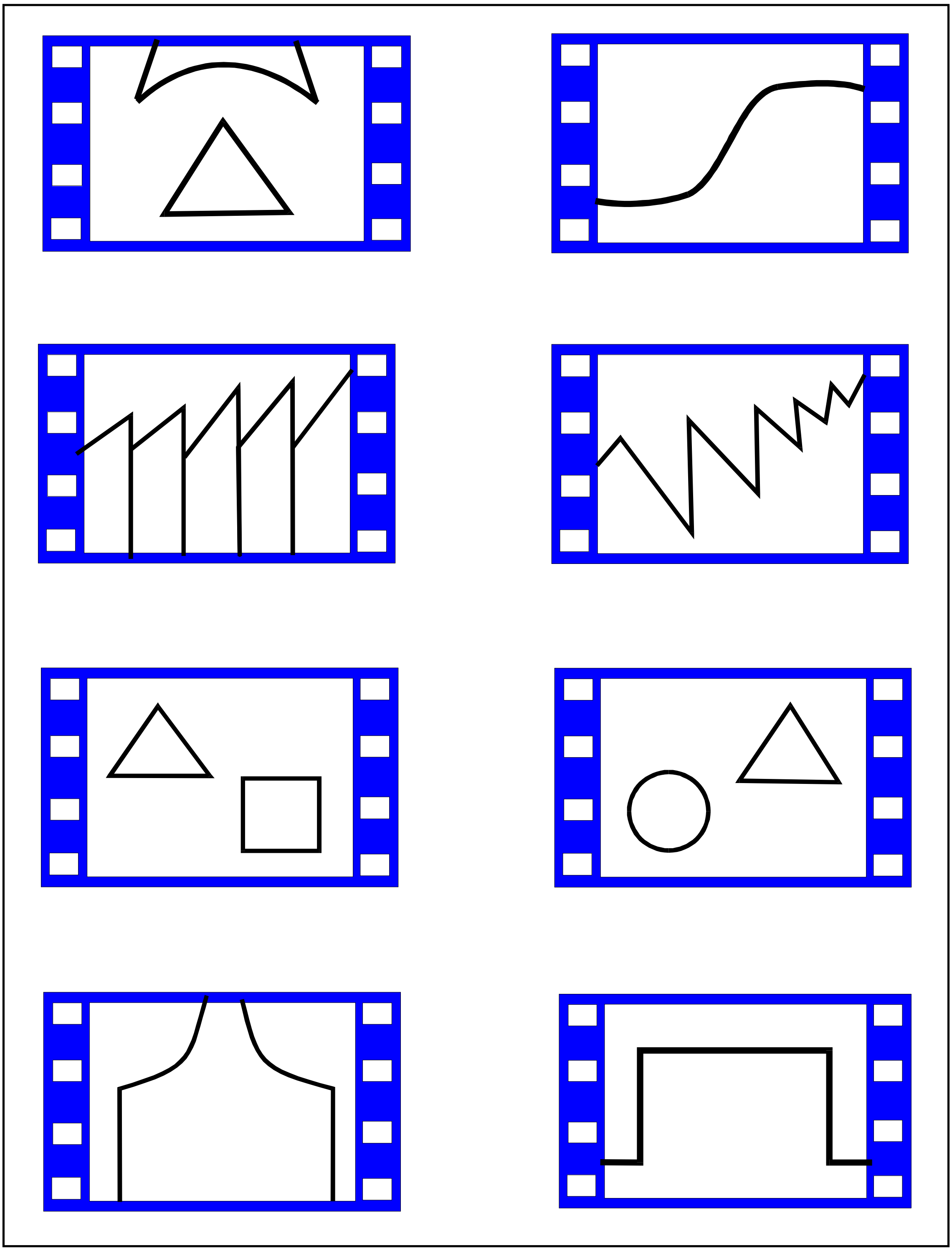

।। ছবির রেখা ।।

ছবির মধ্যে রেখা ! সেটা আবার কী ?

কবিতা পড়ার সময় আমরা যেমন কমা, সেমিকোলন, ড্যাস, দাঁড়ি ইত্যাদি চিহ্ন অনুযায়ী কম বেশী থেমে, ছন্দ অনুসরণ করে কবিতা পড়ি, তেমনি আলোকচিত্র, ছবি দেখার সময় লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো, ফ্রেমের সব বিষয়বস্তুর উপর আমাদের চোখ সব সময় স্থির থাকছে না । ফ্রেমের মধ্যে আমাদের চোখ যেভাবে ছবি দেখছে, ঘুরছে অর্থাৎ আমাদের চোখের গতিপথকে যদি একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে প্রকাশ করি, তাহলে দেখবো, ফ্রেমের মধ্যে গড়ে উঠেছে ছন্দোবদ্ধ রেখাচিত্র । যেটা কম্পোজিশনের মৌল কাঠামো । কম্পোজিশনই বলে দেয় ছবির মধ্যে কী ধরনের রেখা আছে ।

আলোকচিত্রে ছবির রেখা বুঝতে হলে উপলব্ধি করতে হবে ছবিতে দৃষ্টিভ্রমের বিষয় এবং বিভিন্ন রেখার ও বস্তুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য । চোখের সামনে অন্ধকার, দৃষ্টি আড়াল করে এমন কিছু থাকলে আমাদের দৃষ্টি বাধা পায় । আবার ফাঁকা মাঠ কিংবা সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে দূরে দিগন্তরেখায় দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় । রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে দেখবো লাইন দুটো ক্রমাগত অগ্রসর হতে হতে একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার শৈল্পিক নাম 'বিলীয়মান বিন্দু' । ছবির রেখা 'পাঠ' করার জন্যে—পরিপ্রেক্ষি তের এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই অনুধাবন করা প্রয়োজন ।

যে কোন আলোকচিত্র, ছবি—শুধুমাত্র আলোকচিত্র কিংবা ছবি কেন, গান, নাচ, নাটক, যে কোন সার্থক শিল্পকর্মে কতকগুলি অদৃশ্য রেখা দেখতে পাওয়া যায় । যেগুলি শিল্পকর্মকে ছন্দোবদ্ধ এবং গতিময় করে । ফুটবল খেলার গোল করার পদ্ধতি, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ প্রক্রিয়া, মুভমেন্টগুলির কাল্পনিক রেখাচিত্র আঁকলেই আমরা পেয়ে যাবো ফুটবল খেলার মধ্যে ছন্দের সন্ধান । ক্রিকেট খেলায় ফিল্ডিং সাজানোর পদ্ধতির মধ্যেও আছে ছন্দোবদ্ধ রেখাচিত্র । অবশ্য সমস্ত ক্রিকেট খেলাটাই একটা জ্যামিতিক ব্যাপার । মূলত ছবির অদৃশ্য রেখাগুলি হরাইজনটাল—ভারটিক্যাল—কার্ভ (চিনা = সরলরেখা Straight line, গালা = নতোদর/Concave line, গালতা = উন্নতোদর/Convex line) রেখার সমষ্টি।

সার্থক শিল্পকর্ম দর্শকের মনে কিছু না কিছু অনুভূতি সৃষ্টি করে । শিল্পীর ভাব সৃষ্টি করে রস । ভাবরস আর কল্পনার মধ্যেও ছবির রেখা উপলব্ধি করা যায় । সরলরেখা মনে স্থিরতা আনে । ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সংযম ও বলিষ্ঠতার প্রতীক । আবার বক্ররেখা মনকে চঞ্চল এবং গতিময় করে । ছবির মধ্যে বিপরীত মনোভাব এবং দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করতে পারে । ছবির ছন্দোবদ্ধ ও গতিময় রেখা দর্শকের দৃষ্টিকে গতিদান করে, নন্দিত করে—আকৃষ্ট করে ।

'আকৃতির সৌন্দর্য বিষয়ে মাইকেল এঞ্জেলো কথিত কয়েকটি কথা লোমাজমোর লেখায় পাওয়ার পর শিল্প হোগার্থের মাথায় এই ধারণাটি বাসা বাঁধে যে, অঙ্কন শিল্প একটা সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রত হতে পারে । এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে ১৭৪৫ সালে তিনি তাঁর নক্সা খোদাই শিল্পের বইয়ের জন্য একটা মলাট পরিকল্পনা করেন এবং তাতে তরঙ্গায়িত রেখা দিয়ে মাঝামাঝি দাগ কেটে ছবির মত বর্ণাধার এঁকে 'The line of beauty' এ কথাটা লিখে রাখেন । অসংখ্য রেখার মধ্যে একটি রেখাই সৌন্দর্যরেখা পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য এবং সেই রেখাটি হচ্ছে বেঁকা বা সর্পিলরেখা ।' কবি কোলরিজ বলেছেন, কবিতার চলন সাপের মতো। 'সর্পিলরেখার শৈল্পিক নাম—'Line of grace' আবার আমরা শুনতে পাই জটিল রেখা সুন্দর, কারণ

সক্রিয় মন নিযুক্ত থাকতে চায় এবং চোখ শিকারের পিছনে ছোটার গতিতে আনন্দ পায় ।

১৭৯২ সালের পর 'ই প্ল্যাণ্টার' হোগার্থের সৌন্দর্য রেখার গবেষণাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং শিল্পের মধ্যে যৌন আনন্দের প্রতিস্পন্দন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি । সমগ্র সৌন্দর্যের-কেন্দ্র-নারীদেহ থেকে যা উদ্ভূত হয়নি, এমন সৌন্দর্য কোথায় পাওয়া যাবে ? —এই প্রশ্ন তিনি করেছেন । তরঙ্গায়িত রেখা এই কারণেই সুন্দর যে তা নারী-সুলভ । সংগীতের সুরেলা স্বর (টোনস্) সুন্দর, কারণ তার একটা অন্যটার মধ্যে মিলিয়ে যায় ।

আর একজন নন্দনতাত্ত্বিক ভিঙ্কেলম্যান (১৭৬৪) যদিও নারীদেহের স্থানে পুরুষের দেহকেই পূর্ণ সৌন্দর্যের পূর্ণতর বিগ্রহ বলে স্বীকার করেছেন, তথাপি আমরা যে সুন্দরী নারীর দেহকে, এমন কি সুন্দর পশুর দেহকে প্রশংসা করে থাকি, এই সত্য ঘটনার দিকে তিনি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন নি ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—'ই প্ল্যান্টার' যেমন নারীর দেহের মধ্যে তরঙ্গায়িত রেখার সন্ধান পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমি পুরুষের দেহে এক প্রকার বলিষ্ঠ ঋজু দৃঢ় রেখার সন্ধান পাই । সুন্দরী নারী যেমন আমাদের আকর্ষণ করে, সুন্দর পুরুষও আমাদের আকৃষ্ট করে । ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ গাভাসকার যেমন বলেন—ইমরান যখন বল করার জন্য দৌড় শুরু করেন, দৃশ্যটা হয়ে যায় নৈসর্গিক । পুরুষের দেহের রেখা বুঝতে হলে অনুধাবন করতে হবে 'নটরাজ' মূর্তির গঠন বৈশিষ্ট্য । সেই সঙ্গে জিমন্যাস্টিক, নাচ, ব্যালের ফিগারগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে শরীরের রেখার গঠন বৈশিষ্ট্য । উৎসাহী পাঠক নন্দলাল বসুর 'শিল্পচর্চা' বইটি পড়লেই সন্ধান পাবেন নব রসের নব রেখার । পাঠক আর একটু এগিয়ে গিয়ে প্রাচীন চৈনিক এবং জাপানী কিছু কিছু ছবি বিশ্লেষণ করলেই সন্ধান পাবেন শর্টহ্যাণ্ড রেখার সংকেতের মতো চৈনিক ও জাপানী ধর্মের বিভিন্ন রূপক । অজন্তার কিছু কিছু গুহাচিত্র বিশ্লেষণ করলেও সন্ধান পাওয়া যাবে কতকগুলি অদ্ভুত ছন্দোবদ্ধ রেখাচিত্রের, যেগুলি জাতকের কাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ।

'ই প্ল্যান্টার' সৌন্দর্যের মধ্যে যে যৌন আনন্দের স্পন্দন দেখতে পেয়েছিলেন তা ভ্রান্ত, কারণ, সৌন্দর্য কখনও আমাদের রিপুর স্থুল চাহিদা পূরণ করে না । সুন্দরের আবেদন রিপুর অনেক ঊর্ধ্বে—চেতনার মধ্যে এবং ব্যাপক ।

মানুষ যে সৌন্দর্যের মধ্যে যৌন আনন্দ উপভোগ করে সেটা সম্পূর্ণ একক ইন্দ্রিয় সুখ । যৌন আনন্দের রহস্য লুকিয়ে আছে প্রকৃতির সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে । প্রকৃতির প্রতিটা প্রাণী বিপরীত লিঙ্গকে আর্কষণ করে দেহের ধর্ম অনুযায়ী সৃষ্টির তাগিদে। এটাই প্রাণের স্বধর্ম এবং জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ । কিন্তু মানুষের সন্তান সৃষ্টির তাগিদ এবং শিল্প সৃষ্টির তাগিদ সম্পূর্ণ আলাদা । দেহের ক্ষুধা আর মনের ক্ষুধার প্রকৃতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হলেও মূলত ভিন্ন ।

লক্ষ্যণীয়, 'ই প্ল্যান্টার' বিপরীত লিঙ্গ নারীদেহকে সমগ্র সৌন্দর্যের কেন্দ্র মনে করেছিলেন । তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই তিনি শিল্পের মধ্যে যৌন আনন্দ উপভোগ করেছিলেন । কোন নারীও পুরুষ দেহকে সৌন্দর্যের কেন্দ্র মনে করে শিল্পের মধ্যে যৌন আনন্দ উপভোগ করতে পারেন । কিন্তু অবাক হবার বিষয়, পুরুষ পুরুষের মধ্যে এবং নারী নারীর মধ্যেও সৌন্দর্যের স্পন্দন পান । যেমন বহু নারীর হৃদয় হরণকারী স্বপ্নের পুরুষ ইমরান খান আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। কোন অভিনেত্রী নয়, স্টেফিগ্রাফকে সৌন্দর্যের বিগ্রহ মনে হয় ।

সৌন্দর্যের প্রতীক নারী । নারী প্রকৃতিরই ভিন্ন রূপ । প্রকৃতির গর্ভেই সৃষ্টি হয় পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য । বিশেষত নারী যখন মা হয় সেই রূপ আমরা ভোগ করি না । বন্দনা করি—অনুভব করি । সৌন্দর্য নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর, মহিমান্বিত।